বিজ্ঞান ও প্রত্যাশা

তপন চক্রবর্তী

বিজ্ঞান ও প্রত্যাশা

তপন চক্রবর্তী

BANSDOO Library
Dhaka

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০১
জুন ১৯৯৪

বাএ ৩০৮০

পাণ্ডুলিপি
ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ

প্রকাশক
সুব্রত বিকাশ বড়ুয়া
পরিচালক
ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০

16155

মুদ্রাকর
আশফাক-উল-আলম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

মূল্য
সত্তর টাকা মাত্র

BIJNAN O PRATYASHA (A collection of Eassays on some aspects of Science) BY TAPAN CHAKROBORTY. Published by Subrata Bikash Barua, Director, Language, Literature, Culture and Journal Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Edition, June 1994. Price : Taka 70.00 only.

ISBN 984-07-3089-4

উৎসর্গ

অগ্রজপ্রতিম
অধ্যাপক পীযূষ চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক রমেন্দ্রকুমার দেবনাথ
ও
বৌদি অধ্যাপিকা শুভ্রা দেবনাথ

প্রসঙ্গ—কথা

বিজ্ঞানের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। এই প্রত্যাশা দিন দিন বাড়ছে। এর জন্য অবশ্য বিজ্ঞানই দায়ী। বিশেষ করে দায়ী হচ্ছে প্রযুক্তি যা বিজ্ঞানের ফলিত রূপ। বিজ্ঞান মানুষকে বেগ দিয়েছে এবং মানুষের আবেগকে সংহত করায় এবং যুক্তিনির্ভর হতে সাহায্য করেছে। মানুষের জীবনে আরাম–আয়েস ও নিরাপত্তা দিয়েছে। মানুষে মানুষে মিলনের সেতুবন্ধ নির্মাণ করেছে। সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সমঝোতা, সহযোগিতা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছে। তবু এখনো মানুষের সামনে রয়েছে অনেক বড় বড় সমস্যা। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এরা অপরিমেয় কুসংস্কারের পাঁকে নিমজ্জিত। বিশ শতক শেষ হবার আগেই পৃথিরীর জনসংখ্যা সাড়ে পাঁচশ কোটির উপর। মানুষের অপরিকল্পিত অদূরদর্শী কর্মকাণ্ড পৃথিবীর মাটি, জল ও বাতাসকে দূষিত করে তুলেছে। এটি জীবজগতের জন্য একটি বড় হুমকি। এ ছাড়া মানুষের আবাসন, স্বাস্থ্য, বিনোদন ইত্যাদি সমস্যা তো আছেই। মানুষ এ সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী।

বিজ্ঞান এ সকল সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত আছে ও থাকবে। কিন্তু সুরাহার লক্ষণ খুব একটা স্পষ্ট নয়। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমস্যা আরো পল্লবিত হচ্ছে। এর কারণ খোঁজা দরকার। কারা এ জন্য দায়ি তা শনাক্ত করা দরকার। রোগের কারণ ধরতে না পারলে রোগ আরোগ্য করা যায় না। আমি বিজ্ঞানের কাছে মানুষের প্রত্যাশার স্বরূপ এবং তাদের প্রত্যাশা পূরণের প্রতিবন্ধকতা কোথায় তা এই গ্রন্থে অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। রাখঢাক না করে আমার বক্তব্য ও মন্তব্য খোলাখুলি উপস্থাপন করেছি। কোনো কোনো প্রসঙ্গে হয়তো পুনর্কথন অতিকথন হয়েছে বা কোথাও আবেগ–আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারি। প্রয়োজনে বা বিজ্ঞান ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার কারণে এমনটি ঘটে যেতে পারে। এটি মানবিক ত্রুটি হিসাবে বিবেচনা করতে অনুরোধ করি। আমার জানার সীমাবদ্ধতার জন্যে বা অমনোযোগের দরুন তথ্য ও তত্ত্বগত ভুল হতে পারে। পাঠককুল অনুগ্রহ করে ভুল বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আশা করি বাধিত করবেন।

গ্রন্থে মোট তেরটি নিবন্ধ সংকলিত হয়েছে। 'পরিচয়', 'অধুনা', 'ঐতিহ্য', ইত্যাদি মাসিক এবং 'সংবাদ', 'ইত্তেফাক' ইত্যাদি দৈনিক পত্রিকায় এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। মাসিক ও দৈনিকের সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদকবৃন্দের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ ধরনের প্রবন্ধ লেখার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন কবি শ্রীঅসীম সাহা, প্রবন্ধকার জনাব মিনার মনসুর ও অনুজপ্রতিম বিশিষ্ট লেখক ফরহাদ খান। এঁদের কারো বিজ্ঞানের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। এঁরা বিজ্ঞান-মনস্ক ও সমাজ-সচেতন। আমি এঁদের শ্রদ্ধা করি।

বাংলা একাডেমীর ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং এখন তাঁদের প্রয়াস সফল হতে যাচ্ছে। এই উপবিভাগের সকল সহকর্মী বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আন্তরিক ছিলেন এবং তাঁরা এর জন্য অকৃপণ শ্রমদান করেছেন। আমি তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

৩৬২ এলিফ্যান্ট রোড
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

তপন চক্রবর্তী

সূচিপত্র

মানুষের প্রত্যাশা ও বিজ্ঞান	১
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৮
বিজ্ঞান ও মানবিকতা	১৩
গ্রামীণ মানুষে বিজ্ঞান–মনস্কতা সৃষ্টি	২১
পরিবেশের উপর মানুষের প্রভাব	৩০
মহাপ্লাবনের প্রতীক্ষায়	৪০
লোকঐতিহ্যে অরণ্য	৪৬
জীববৈচিত্র্য	৫১
লোকচিকিৎসা	৬১
বার্ধক্য প্রহেলিকা	৭২
ভাইরাস গবেষণা	৮০
রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র	৯০
মহাকাশ গবেষণা	৯৫

মানুষের প্রত্যাশা ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের প্রত্যাশাকে অনেক বেশি পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। সরকারি প্রচার মাধ্যম, সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যম, বিজ্ঞান ক্লাব ও সংগঠন, বিদেশী রাষ্ট্রের প্রচার মাধ্যমসমূহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রচুর আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। ফলে মানুষ চায় অবিলম্বে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার অবসান হোক। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, পানীয় জল, জ্বালানী, পশুখাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মনিযুক্তির সার্বিক ব্যবস্থা গৃহীত হোক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা হোক। উৎপাদনের হার বৃদ্ধি হোক এবং উৎপাদনের মানও সমৃদ্ধ হোক। কর্মদক্ষতার উন্নয়ন ঘটুক। সে সঙ্গে মানুষ বিদেশী প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা হ্রাস ক'রে নিজ দেশে নবতর প্রযুক্তির বিকাশ দেখতে চায়। কোনো কোনো প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে সে-ক্ষেত্রে পৃথিবীতে নেতৃত্বও প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

কেউ কেউ এখনো প্রশ্ন তোলেন, যে-সময়ে বিজ্ঞানের প্রতি জনসমর্থন ছিলো প্রায় শূন্যের কোঠায় সেসময়ে এ দেশে, নোবেলজয়ী সি.ভি. রামন, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, ডঃ কুদরাত-ই-খুদার মতো বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটেছিলো ; অথচ আজ যখন মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা বেড়েছে এবং জনগণ বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে অনেক বেশি অংশ নিচ্ছে তখন কোনো নন্দিত গবেষক ও বিজ্ঞানকর্মীর সৃষ্টি হচ্ছে না। বিশ্বনন্দিত এই বিজ্ঞানীরা কখনো সরকারি আনুকূল্য লাভ করেননি বরং সরকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে নানাভাবে। এখনকার সরকারসমূহ এ ব্যাপারে বেশ সাহায্য-সহযোগিতা দিচ্ছে। তবু অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না। মানুষের মনে প্রশ্ন-এত উদ্যোগ, অর্থব্যয় ও আয়োজন সত্ত্বেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অক্সফোর্ড, ক্যাম্ব্রিজ বা ব্রিসটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ ও সমমর্যাদাপূর্ণ হয়ে উঠছে না কেন ?

চিন্তার নতুন দিগন্ত সম্প্রসারণ, নতুন প্রাণচাঞ্চল্য ও গতিময়তা সৃষ্টি ও নব নব সৃষ্টির আবেগ সঞ্চারণ বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। এই সকল বৈশিষ্ট্য একটি দেশের উন্নয়ন

প্রক্রিয়াকে শিখরমুখী করে, ফলে সে দেশটি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয় এবং দেশটি তখন বিশ্বের উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালনের যোগ্যতা অর্জন করে। প্রত্যেক দেশের মানুষ তার স্বদেশকে বিশ্বের একটি উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। বিজ্ঞানের সাহায্যে যে এ কাজটি সম্ভব মানুষের মনে এ বিষয়ে আজ আর কোনো সংশয় নেই। মানুষের এই আশাকে কোনো মতেই অবৈধ বা অবাস্তব বলা যাবে না। যে ভাবেই হোক না কেন মানুষের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। এ আশা মেটাতে হবে।

আশা সৃষ্টির আরো একটি কারণ আছে। তা হলো, আজকাল সরকার ও জনগণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে বেশ বড় ধরনের ব্যয় করছে। আশা পূরণ হচ্ছে না বলে মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ ও ধৈর্যহীনতা দেখা দিচ্ছে। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কিছু কিছু প্রয়োগ সত্ত্বেও মানুষের দুঃখ–দারিদ্র্য, অভাব–অনটন, নিরাপত্তার অভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে ; অথচ অন্যদিকে জমছে অপচয় ও বিত্তের পাহাড়।

সামাজিক প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দু' ধরনের সমস্যাকে পরিষ্কারভাবে শনাক্ত করতে হবে। এক, সমস্যা সমাধানে গবেষণালব্ধ নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন এবং দুই, বর্তমান অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, প্রয়োজনবোধে এর সঙ্গে কিছু সংযোজন করে সমস্যা সমাধানের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ।

বর্তমান অভিজ্ঞতাকে প্রয়োগ করে সাম্প্রতিককালের পূর্বে উল্লেখিত অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব। এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে কেবল উদ্যোগী হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ— স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, পুষ্টি, পয়ঃপ্রণালী, বিশুদ্ধ পানীয় জল, বাসস্থান, বস্ত্র ও নিরক্ষরতার মতো সমস্যা স্বল্প সময়ে সমাধান করা যায়। সামাজিক ও রাজনীতিক উদ্দেশ্য যদি সৎ হয় তাহলেই গরিব ও অবহেলিত জনগণের এ সকল সমস্যা নিরসন করা দুঃসাধ্য নয়। এর জন্য বিরাট অংকের অর্থব্যয়েরও প্রয়োজন পড়ে না।

পাশ্চাত্যের দেশসমূহে একশ' বছর আগে স্বাস্থ্য সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছিলো, যদিও সে–সময় আজকের মতো চিকিৎসাশাস্ত্রের এতো উন্নতি ঘটেনি। একশ' বছর আগে সে–সব দেশের মানুষের আর্থিক অবস্থা, জীবনধারণের মান, সাংস্কৃতিক বিকাশ ও জনস্বাস্থ্যের সন্তোষজনক উন্নতিসাধন সম্ভব হয়েছিলো। আমাদের দেশে নির্মূল বলে ঘোষিত রোগসমূহ এখনো মাঝে মাঝে হানা দেয়; অথচ ওসব দেশে তার প্রাদুর্ভাব ঘটে না। এখানে প্রাদুর্ভাবের কারণ হলো দারিদ্র্য। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কৌশল, অর্থ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে

একদিন বসন্ত নির্মূল কর্মসূচি লক্ষ্যভেদে সফল হয়েছিলো। সে ধরনের উদ্যোগ নিলে রাতকানা রোগ, শিশু উদরাময়, গলগণ্ড ; মহিলাদের রক্তশূন্যতা ইত্যাদিও নির্মূল করা যায়। মানুষ আজো পানি–দূষণে বা অপরিশোধিত পানি খেয়ে মারা যায় কেন ? এর জন্যে তো উন্নত প্রযুক্তির আবশ্যকতা নেই। বিশাল অর্থ ব্যয়েরও প্রয়োজন পড়ে না। এর জন্য দরকার কেবল সদিচ্ছা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা। এদেশে কৃষিবিজ্ঞানীরা কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার ক'রে উন্নতমানের, অধিক উৎপাদনশীল জাতের বীজ তৈরি করেছেন। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে যদি চাষাবাদ করা যায় তাহলে বর্তমানে যে–পরিমাণ খাদ্যোৎপাদন হবে তাতে দেশ খাদ্যে স্বয়ংনির্ভর হওয়া সম্ভব। বন্যা, খরা সত্ত্বেও খাদ্যের ঘাটতি হবার কথা নয়। তবু কেন মানুষ না খেয়ে মরে, অপুষ্টিতে ভোগে ? কারণ হলো, মানুষের ক্রয়–ক্ষমতার অভাব। খাদ্যদ্রব্য মজুদ থাকলে কী হবে, মানুষের তো কেনার ক্ষমতা নেই। জনগণের অর্থ উপার্জনের সুষ্ঠু উপায় ক'রে দিতে হবে সমাজকে, রাষ্ট্রকে। নতুবা মানুষ অনাহারে–অর্ধাহারে থাকতে বাধ্য হচ্ছে, হবে। মানুষ ভয়াবহ অপুষ্টির শিকার হবে।

মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণকল্পে দেশের সর্বসাধারণকে বিজ্ঞান কর্মযজ্ঞের অংশীদার করতে হবে। অন্যথায় এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। মানুষের অংশগ্রহণ তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে যদি সে মানুষগুলোর ন্যূনতম শিক্ষা থাকে। অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও অনুন্নয়ন একসূত্রে গাঁথা। এ–দেশে ক' দিন আগে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হলো। যদিও এ–ঘোষণার মধ্যে আন্তরিকতা কী পরিমাণ তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। একই সঙ্গে মেয়েদের জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। দেশের সর্বমোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগ অক্ষরজ্ঞানহীন। বিংশ শতাব্দীর শেষে যেখানে এই অবস্থা সেখানে এ–জাতির ভবিষ্যত কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। মানুষের রুজি–রোজগারের উপায় সৃষ্টি করতে না পারলে, মানুষের আর্থিক অবস্থার সন্তোষজনক উন্নতি না হ' লে সরকারি উদ্যোগে ব্যাপক ও নিরলস প্রয়াসের মাধ্যমে অশিক্ষার অভিশাপ থেকে জনগণকে মুক্তি দিতে না পারলে দেশের অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যাবে।

সামাজিক পরিবর্তনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যদি শক্তিশালী হাতিয়ার বিবেচনা করা হয়, তাহলে সমাজের সব স্তরে বিজ্ঞান–মনস্কতাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। সাধারণ মানুষ ও শিক্ষিত ব্যক্তি, বিশেষ ক' রে বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে পার্থক্য ঘোচাতে হবে। এ জন্যে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার সব স্তরে চালু করতে হবে। সমান সুযোগ ও জাতীয় সংহতি রক্ষার স্বার্থে সবার জন্য এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন

থাকবে। অবশ্য সবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিস্তারের যে-কাহিনী ফলাও ক'রে প্রচার করা হয়, তার মধ্যে বড় ধরনের ফাঁক ও ফাঁকি থাকে। এতে গরিব আরো গরিব হয়, ধনী হয় আরো ধনী। এ-ব্যাপারে দু'একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে।

মানুষের আবিষ্কারসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অন্যতম আবিষ্কার হলো বিদ্যুৎ। আজকাল পল্লীবিদ্যুতায়নের ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। গ্রামীণ জন-সাধারণের জীবনের মান বৃদ্ধিই নাকি এর লক্ষ্য। স্মর্তব্য যে, আমাদের গ্রামাঞ্চলের মানুষ প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। স্বল্পসংখ্যক লোক বিত্তশালী ও মহা-বিত্তশালী আর অধিকাংশ জন-সাধারণের অবস্থান দারিদ্র্য-সীমার নিচে। বিদ্যুতের আশীর্বাদ গ্রহণে সক্ষম হলো মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত জনগণ। গৃহস্থালী ও চাষের কাজে বিত্তশালী স্বল্পসংখ্যক লোক বিদ্যুৎকে কাজে লাগিয়ে আরো মুনাফার সুযোগ পাবে। পাওয়ার পাম্প কিনতে পারে ক'জন ? সেচের পানি সরবরাহ ক'রে তারা জমি পিছু দাদন বসায়। অথচ যে সব শ্রমিক সেচের কাজে নিয়োজিত হতো, তারা মজুরি হারাচ্ছে। একই কথা ট্রাক্টর বা সার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। গ্রামাঞ্চলে আজকাল উন্নত প্রযুক্তি পত্তনের ফলে অসংখ্য বেকার ও অর্ধবেকার সৃষ্টি হচ্ছে এবং ন্যূনতম মজুরিতে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। শহরাঞ্চলেও ব্যাপকহারে কম্পিউটার ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হতে চলেছে। এক মুদ্রণ শিল্পে কম্পিউটার কম্পোজ ও ফটো কম্পোজ চালু হওয়াতে এই ঢাকা শহরে মুদ্রণ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের আহাজারি শুরু হয়েছে। এ সকল কৃষি ও শিল্প শ্রমিকদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা না করে এ ধরনের প্রযুক্তি আমদানি ও প্রবর্তন, কতখানি যুক্তিযুক্ত তা আগেভাগে খতিয়ে দেখার আবশ্যকতা ছিলো। অন্যথায় প্রবর্তিত উন্নত প্রযুক্তি বিষয়ে মানুষের ধারণার বিপর্যয় ঘটবে। মানুষ একে সাদরে বরণ করে নেবে না।

বিজ্ঞান সম্পদের ও জনশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে। উন্নত দেশে মাথাপিছু আয়ের হার অনেক উঁচুতে। সে-সব দেশে দারিদ্র্য শব্দটি কেবল অভিধানেই আছে বলা যায়। কিন্তু অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য শব্দটি খুবই অর্থব্যঞ্জক এবং এর বাস্তব অস্তিত্ব বড়ই প্রকট। কাজেই, এখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের আগে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পূর্ণ চিত্র সামনে রাখতে হবে।

আমার বক্তব্য পড়লে কেউ আমাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার-বিরোধী ভাবতে পারেন। আমি জানি ব্যাপক জনসাধারণের দারিদ্র্য মোচনে ও অশিক্ষা অপনোদনে বিজ্ঞান দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিপ্রদত্ত

সুযোগসমূহ দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করবে কে ? সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি এ-সবের সমবন্টনের দায়িত্ব না নেয় তাহলে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ ভোগ করবে ধনীরা। একদিকে চরম দারিদ্র্য, অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি। এতে ভারসাম্য থাকা কি সম্ভব? মতিঝিলের চমৎকার গগনচুম্বী প্রাসাদের ঠিক পাশেই খালের পাড়ের বস্তি আমাদের তৃতীয় নয়ন খোলায় সাহায্য কি করে না!

উপজেলা পর্যায়ে টেলিফোন নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হচ্ছে, রাস্তাঘাট হচ্ছে। টেলিফোনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে লাখে ক' জন ? সরকারি দলের বা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বিদ্রোহ হলে দ্রুত খবর পেয়ে, ততোধিক দ্রুতগতিতে মোটরযান, হেলিকপ্টারে ছুটবে লেঠেলবাহিনী। সে-রকম দ্রুত ব্যবস্থা বন্যা, দুর্ভিক্ষপীড়িত, মহামারী আক্রান্ত জনগণের ক্ষেত্রে নেয়া হবে কি ? ভুখা-নাঙ্গা মানুষ যখন অস্ত্র হাতে তুলে নেবে তখন স্যাটেলাইট নির্দিষ্ট স্থানটি চিহ্নিত ক' রে দেবে আর ক্যাম্পে বসেই রকেট, লাঞ্চার ছুটবে বিদ্রোহ-বিপ্লব দমনে। তখন জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন দুঃসাধ্য হবে বলে আশংকা হচ্ছে। এ-ক্ষেত্রে শোষকের বিজ্ঞান শোষিতের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবে।

পাশ্চাত্যে বড় বড় কোম্পানির কাজে রবোট চালু করা হয়েছে। বলা হচ্ছে রবোট শব্দ, ধুলোবালি, তাপ, ঠাণ্ডার মধ্যে কাজ করতে পারে নিখুঁতভাবে। এদের নির্দিষ্ট কাজ শেষে এরা ক্লান্ত হয় না। এদের বছর বছর বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হয় না। কাজেই উৎপাদিত পণ্যের দাম স্থিতিশীল থাকে। আসল কথা হলো, এরা বেতন বাড়ানোর জন্য আন্দোলন করে না। এদের ছাঁটাই করার প্রয়োজন হয় না। কলকারখানায় লক-আউট ঘোষণার প্রয়োজন পড়ে না। পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। ফলে সে-সব দেশে রবোট অসংখ্য লোকের কর্মচ্যুতির কারণ হয়েছে। প্রচুর সংখ্যক লোক বেকার হচ্ছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এ প্রযুক্তির প্রবর্তন হ' লে কী ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে ভাবা যায় না।

যে-বিজ্ঞান একদা বস্তুবাদী দর্শন প্রসারে সহায়তা দান করতো, মানুষের মন থেকে অন্ধবিশ্বাস তাড়ানোর ভূমিকা নিতো এবং ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তাভাবনাকে বাস্তবমুখী করায় সচেষ্ট থাকতো, সেই বিজ্ঞানই আজ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মানুষকে শুধুমাত্র ঈশ্বরমুখী করে তুলেছে। ভাববাদী দর্শনের মূলকথা হলো, অশিক্ষিত, দরিদ্র, অত্যাচারিত ও অসহায় মানুষের একমাত্র অবলম্বন ; বাক্য, মন ও চিন্তার অতীত ভগবান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অধিক সংখ্যক বেকার, অর্ধবেকার, দরিদ্র জনগোষ্ঠী সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগাচ্ছে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে। আজকের বিত্তহীন মানুষ আগের

তুলনায় অনেক বেশি অসহায়। ফলে ওরা অনেক বেশি ঈশ্বর-নির্ভর হয়ে উঠেছে। এ-সব দেশে বিজ্ঞান পরোক্ষে মৌলবাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

আজকের সমাজের অবস্থা হলো "জোর যার মুল্লুক তার"। এখানে সদিচ্ছা ও লক্ষ্য অর্জনে অনেক প্রতিবন্ধকতা আসে। দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা জাগাতে হ'লে, বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা দিতে হ'লে প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করে সঠিক ব্যবস্থা নিতে হবে। অর্থাৎ মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার স্তর এমন পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে যাতে তারা বিজ্ঞানের বাণী বুঝতে পারে ও ধারণ করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের আর্থিক সঙ্গতিও বাড়াতে হবে, যাতে তারা জীবনধারণের মান বৃদ্ধিতে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারে।

আমাদের মতে বিজ্ঞানের সুফল লাভে ব্যর্থ হবার মূল কারণ ব্যাপক নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য। নতুন নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রবর্তনের আগে এ-বিষয়টির দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজে লাগানোর স্বার্থে নিরক্ষরতা দূরীকরণে কর্মসূচি গ্রহণ অতি জরুরি। নতুবা মধ্যস্বত্বভোগীরা বিজ্ঞানের সুফল লুট করে নিতে থাকবে। ধরা যাক, আমাদের দেশে ফসল সংরক্ষণের জন্য আণবিক তেজস্ক্রিয়তা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হলো। এতে ফসল অনেকদিন ধ'রে সংরক্ষণ করা যাবে এবং ফসল অপচয়ের সম্ভাবনা কমে যাবে। অশিক্ষিত গরিব কৃষক এ-সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না। গরিব কৃষককে ফসল বিক্রি ক'রে দিতে হবে। মধ্যস্বত্বভোগী বিত্তবানরা এ-প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ফসল মজুদের পরিমাণ বাড়াবে এবং বাজারে খাদ্যশস্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে ফসলের মূল্য বাড়িয়ে দেবে। মধ্যস্বত্বভোগীদের রক্ষাকারী ও তাদের ভাগীদার সরকার নিশ্চয়ই নীরব ভূমিকা পালন করবে। ফলে কৃষককুল ও ক্রেতাকুলকে উন্নত প্রযুক্তির জন্য খেসারত দিতে হবে। এ-দেশে কোল্ড স্টোরে আলু সংরক্ষণের সুযোগ থাকাতে আলুর মরশুমেও আলুর দাম কতো চড়া থাকে তা আশা করি ভুক্তভোগী সবাই জানেন।

অনেকে আধুনিক বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কারে অভিভূত হয়ে পড়েন। ক্যাট স্ক্যান, কৃত্রিম হৃৎকপাটিকা স্থাপন, বৃক্ক সংস্থাপন ইত্যাদি প্রযুক্তি আবিষ্কারে সাধারণের উল্লসিত হবার কোনো কারণ দেখি না। এ-গুলো করাতে লাখ লাখ টাকার দরকার। এদেশে গড়পড়তা মাথাপিছু ২/১ টাকা চিকিৎসা খাতে ব্যয়ের সুযোগ আছে মাত্র। জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে দেখা যায় পৃথিবীর ৮০ ভাগ লোক আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আমাদের মতো দরিদ্র দেশে যথাযথ চিকিৎসার সুযোগের অভাবে এক বছর বয়সী সর্বমোট শিশুর প্রায় অর্ধেক মারা যায়। কাজেই,

ও–সব প্রযুক্তি আমাদের কাছে সোনার হরিণ। যে–দেশের অধিকাংশ মানুষ খালি পেট, আধপেটা থেকে ধুঁকে ধুঁকে মরে, সেখানে রঙিন টিভি, ডিজিটাল টেলিফোন, কম্পিউটার, মার্কারী লাইট, বিদেশী কার, শীততাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা বই আর কিছু নয়।

লাগসই প্রযুক্তি ও অপ্রচলিত শক্তির উৎস অনুসন্ধানের ব্যাপারে উপদেশ বর্ষণ করা হয়ে থাকে প্রায়শই। আমি এখানে দু'টো উদ্ভাবনের বিষয়ে আলোচনা করছি। ভারতে গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে বেশ ক'টি অঞ্চলে। ফলে আশপাশের গ্রামে–গঞ্জে গোবরের দাম বেড়ে গেছে অস্বাভাবিক হারে। যারা ঘুটে দিয়ে রান্না করতো তাদের কপালে হাত। তারা বিনে পয়সায় রাস্তাঘাট থেকে গোবর সংগ্রহ করতো। বর্তমানে গোবরের বিনিময় মূল্য তাদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। অনেকে এককালে খামারের আবর্জনা ব্যবহার করতো রান্নাবান্নায়। আবর্জনা থেকে শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে গরিব মানুষেরা পড়ছে বিপদে। এদের তো বিদ্যুৎ, গ্যাস এমনকি কেরোসিন কেনারও ক্ষমতা নেই। বনজঙ্গল উজাড় হওয়ায় কাঠও যোগাড় করতে পারছে না। ফলে চাউল তরকারি যোগাড়ের সামর্থ্য থাকলেও রান্না করে খাবার উপায় নেই।

পরিশেষে, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বিজ্ঞান অনেক উদ্ভাবনী চিন্তা–চেতনা যুগিয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে চাকা আবিষ্কারের পর থেকে আজ অব্দি। বলা বাহুল্য যে, নতুন কোনো বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি কখনো আপামর জনসাধারণের আর্থনীতিক অবস্থান সুদৃঢ় করায় অবদান রাখে নি। শত শত বছরে বিজ্ঞানের যা অবদান তা মানুষকে আয়েসী, সুখী ও আনন্দমুখর করার জন্য পর্যাপ্ত। যারা বিজ্ঞানকে ব্যবহার করায় সক্ষম তারাই এই আয়েস, সুখ ও আনন্দ ভোগ করতে পেরেছে। এদেশের অধিকাংশ দরিদ্র মানুষ নব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান কাজে লাগানোয় সক্ষম নয়। এ–অবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রবর্তন ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য বৃদ্ধিতে আরো সাহায্য করবে ও করছে এবং প্রকৃতপক্ষে দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে ও বাড়বে। সমাজের পরিবর্তন না হলে, জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী সরকার ক্ষমতায় না এলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার বেকার, অর্ধবেকার ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়াবে। জনগণকে ব্যাপক নিরক্ষরতার হাত থেকে নিষ্কৃতি না দিয়ে, জনগণের আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধির প্রয়াস না নিয়ে, উন্নত প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান প্রবর্তন করা ঘোড়ার আগে গাড়ি জোড়ারই শামিল। এতে রথ আর রথী দুই–ই মারা পড়বে। কাজেই, মানুষকে অহেতুক আশার মরীচিকায় ঠেলে দেয়া হবে এক ধরনের নিষ্ঠুর রসিকতা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বিজ্ঞানকে খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখার প্রয়াস প্রবলভাবে সক্রিয় থাকায় এ দেশের বেশিরভাগ শিক্ষিত মানুষ বিজ্ঞানের সার্বিক দর্শনকে অর্থাৎ বিজ্ঞানের মর্মবাণীকে আত্মস্থ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। বিজ্ঞান হিসেবে মানুষ যাকে বরণ করে নিয়েছে বা নিচ্ছে তা বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের ফল। অর্থাৎ মানুষ বিজ্ঞানের নামে প্রযুক্তিকেই গ্রহণ করছে।

বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা সম্পর্কে মানুষ যা অনুভব করে, তার অভিব্যক্তিই হলো বিজ্ঞান। অন্ধকারের আবরণ সরিয়ে আলোর অভ্যুদয় ঘটে, ক্রমে সূর্যরশ্মির প্রতিফলন ঘটে। কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠে চারদিগন্ত। ফুল পাঁপড়ি মেলে, পাখা মেলে প্রজাপতি। অনন্তকাল ধরে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহরাজি ঘুরতে থাকে। এসব সম্ভব হচ্ছে কী করে ? সূর্য অহর্নিশ বিকিরণ করে চলেছে প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তিতরঙ্গ। বিপুল এই শক্তির উৎস কোথায় ? মহাকাশে তারার মেলা। এদের উদ্ভব বিকাশ ঘটে কি ভাবে? পরিণতিই বা কী ? নানান বিচিত্র পদার্থের মেলবন্ধনে পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় প্রাণের স্পন্দন। প্রাণসৃষ্টি এক বিরাট রহস্য। পরমাণুর অন্তরে বন্দী হয়ে আছে অকল্পনীয় অমিত শক্তি। আকাশে মেঘ হয়, বৃষ্টি ঝরে। কখনো বা ঝড়ো হাওয়া। কখনো বজ্র নিনাদে থর থর কম্পমান হয় বাতাস ও মাটি। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে এই উন্মত্ততায় ফুঁসে উঠে প্রাণঘাতী ঘূর্ণিঝড়। আবার শীতে প্রকৃতিতে নেমে আসে স্তব্ধতা, জড়তা। শীতের শেষে নতুন আনন্দে জেগে উঠে ম্রিয়মান প্রকৃতি। বসন্তের মলয় হিল্লোলে, ফুলের সুবাসে প্রাণে প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। প্রকৃতির নানা কর্মকাণ্ড মানুষের মনে হাজারো প্রশ্ন জাগায়। মানুষ প্রকৃতিকে গভীরভাবে দেখে। প্রকৃতির লীলা বোঝার প্রয়াস পায়। একে সুশৃংখলভাবে বোঝার জন্য মানুষ নানা তত্ত্ব ও সংজ্ঞার আশ্রয় নেয়। অভিভূত মানুষ কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে যুক্তি খোঁজে কার্য–কারণের। তার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিকে শানায়। যুক্তি নতুন নতুন বিশ্বাসে তাঁকে পৌছে দেয়। যুক্তিনির্ভর এই মানুষ আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সৃষ্টি করে স্বতন্ত্র মূল্যবোধ। এই মুল্যবোধ সাধারণ মানুষের মননে ও চিন্তায় পরিবর্তন

ঘটায় এবং তাদের দিক নির্দেশনা দেয়। প্রকৃতির রহস্য বা বাস্তবতা আবিষ্কৃত হবার পর মানুষ প্রকৃতিকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করে। প্রকৃতির সমগ্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি শৃংখলা বা নিয়ম রয়েছে, রয়েছে সুদৃঢ় কার্যকারণ, প্রকৃতির নিয়মকে জানা এবং প্রকৃতিকে মানুষের কাজে লাগানোর কৌশল আবিষ্কারই হলো বিজ্ঞান। এর ফলে উদ্ভাবিত উপায় বা উপাদান বা যন্ত্র হলো প্রযুক্তি।

বিজ্ঞান মানব–অনুভূতির এক বিশেষ প্রকাশ। যা মানব সংস্কৃতিরই বিশেষ অঙ্গ। জ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে এর তফাৎ হলো বিজ্ঞান প্রকাশের ভঙ্গি একটু অন্যরকম। এর প্রকাশভঙ্গি সাংখ্যিক বা সাঙ্কেতিক। ফলে তা জনসাধারণের কাছে সহজে বোধগম্য নয়। এ কারণে বিজ্ঞান সম্পর্কে খণ্ডিত চেতনা প্রবহমান রাখা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানকে ভীতির চেহারা দিয়ে উপস্থাপন করা গেছে। ফলে মানুষ বিজ্ঞান থেকে দূরে সরে থাকার চেষ্টা করেছে।

বিজ্ঞান মানুষের আহ্নিক ও বার্ষিক জীবন পরিক্রমার নিত্য সহচর। বিজ্ঞান মানুষের বিশ্বস্ত সাথী। মানুষকে শ্রমের বন্ধন ও দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতেই বিজ্ঞান এগিয়ে এসেছিলো। মানুষের জন্য সুখ, স্বস্তি ও সম্পদ সৃষ্টিতে বিজ্ঞান নিবেদিত। মানুষের কুসংস্কার ও ভয়–ভীতি দূর করার বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছে বিজ্ঞান। মানুষকে স্বাস্থ্য ও পরমায়ু দেবার কাজেও এগিয়ে এসেছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মানুষের চিন্তার দিগন্তকে প্রসারিত করেছে এবং মানুষের মননকে করেছে স্বচ্ছ ও ঋদ্ধ।

বিজ্ঞানের মর্মবাণীই হচ্ছে সমগ্র মানুষের কল্যাণ। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাজনীতি, অর্থনীতির মতো বিজ্ঞানেরও সংকট। এখানে বিজ্ঞানের মর্মবাণীকে সোনার ফ্রেমে বন্দী করে রাখা হয়েছে। শ্রমজীবী ও মেধাজীবী বিজ্ঞানীকে প্রদর্শন করা হচ্ছে তন্ময় জ্ঞানবিভোর দার্শনিক হিসেবে। তাঁর জন্য নির্মিত হয়েছে স্বচ্ছ সূক্ষ্ম কাচের দেয়াল। দেয়াল সৃষ্ট অচলায়তনে তিনি বন্দী এবং মেহনতি জনতার সংস্পর্শ থেকে অনেক দূরে তাঁর অবস্থান। প্রযুক্তির চাকচিক্য দিয়ে বিজ্ঞানের দর্শনকে লোক–মনন থেকে দূরে সরিয়ে এক ধরনের মোহজাল নির্মাণ করেছে। বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি প্রকৃতি নিয়মের বাইরে নয়। প্রকৃতির ধর্মই হলো ভারসাম্য রক্ষা করা। সমাজ ও রাষ্ট্রে যাঁরা ভারসাম্য রক্ষার আদর্শে অবিশ্বাসী এবং স্বীয় স্বার্থে যাঁরা এই ভারসাম্য বিনষ্ট করে তারা বিজ্ঞানকে প্রকৃতি নিয়ম প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর হাতে পায়ে পরায় সোনার শিকল। বিজ্ঞানের নামে প্রযুক্তি চালিয়ে দিয়ে মানুষের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর সামাজিক অবস্থান বিষয়ে আরো খোলামেলা আলোচনা

প্রয়োজন। পূর্বেকার আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, বিজ্ঞান মানুষের সমন্বিত চিন্তা-চেতনা, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিজ্ঞান আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বহিরাগত নয়। বিজ্ঞান আমাদের জীবন প্রবাহের ও মননের সাথে অন্তর্লীন। সমাজ ও রাষ্ট্রের উথান-পতনে, সংশয়-সংকটে, বিজ্ঞানকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। বিজ্ঞানীকে পালন করতে হয় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা। এ ছাড়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর আরো একটি বড় কাজ হলো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ভূয়োদর্শনের মাত্রা কমানোর গতিময় প্রয়াস অব্যাহত রাখা।

প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের বিষয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশ্ব-সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। রবীন্দ্রসাহিত্যেও তার প্রচুর ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। সঙ্গত কারণে প্রশ্ন উঠতে পারে বিজ্ঞানের সাথে প্রযুক্তির সম্পর্ক কী ? মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে তার পরিবেশ-প্রতিবেশকে তার প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তন করে নিতে চায়, গড়ে নিতে চায় এবং এর উপর প্রভুত্ব করতে চায়। ফলে প্রযুক্তির জন্ম অপরিহার্য হয়ে পড়ে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ফলিত রূপ। বিজ্ঞান হলো তত্ত্ব বা দর্শন এবং প্রযুক্তি তত্ত্বকে বাস্তবে রূপদান করে। বিজ্ঞান আইডিয়ার সাহায্যে এই দৃষ্টিগ্রাহ্য জগৎ কিভাবে চলে, এর মধ্যে কী আছে তার জবাব অনুসন্ধান করে এবং জবাব দেবার চেষ্টা করে। যে মানুষ কেবল প্রযুক্তিতে বিশ্বাসী সে এ সকল জিজ্ঞাসার ধার ধারে না। সে নিজের স্বার্থে, অন্যের অসুবিধা হলেও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নিজের জন্য নানান সুবিধার ব্যবস্থা করে। তার বা তার শ্রেণীর প্রয়োজনে জগতের বিজ্ঞানসম্মত প্রতিষ্ঠিত নিয়মের রাজ্যে অনিয়মের ঝড়ো হাওয়া সৃষ্টি করে। জোর করে প্রকৃতি নিয়মকে বদলাতে চায়। পরিবেশকে অন্যায়ভাবে বদলাতে পারার মানে নিজের অক্ষমতাকে অতিক্রম করে অধিকতরো শক্তিশালী হয়ে ওঠা। এ কারণে প্রযুক্তির মধ্যে আসুরিক, মানবতাবিরোধী ক্ষমতার একটা ব্যাপার আছে। এখানেই হলো বিপদ। প্রযুক্তিকে যদি বিজ্ঞান বলে চালানো হয় তাহলে মানুষ বিজ্ঞান সম্পর্কে ভুল বুঝতে থাকবে। বিজ্ঞান দর্শন-নির্ভর, প্রযুক্তি প্রয়োগ-নির্ভর। প্রয়োগের ক্ষেত্রেও দর্শন না থাকলে তা মানবের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই অধিক বয়ে আনবে। কারণ, সমাজের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পালা বদলে প্রযুক্তি আজ মুখ্য কুশীলবের ভূমিকায়। দেখা যাচ্ছে, যাঁরা যতো বেশি প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ও প্রযুক্তিসৃজনে অগ্রগামী তাঁরা ততো বেশি বলবান ও ক্ষমতাধর।

উন্নত প্রযুক্তি বলতে ভারি যন্ত্রপাতি ও জটিল যোগাযোগ ব্যবস্থা যা ব্যয়বহুল ও সীমিত সংখ্যক লোকের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব। ধনতান্ত্রিক সমাজে স্থাবর-অস্থাবর

সম্পদের যারা নিয়ন্তা তারাই উন্নত প্রযুক্তির সৃজক ও মালিক। তাদের শোষণের মূল হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় এই উন্নততর ও নবতর প্রযুক্তি। যন্ত্র নির্ভরশীলতা প্রবৃদ্ধিতে ব্যক্তিমানুষের নৈপুণ্য, সৃষ্টিশীলতা বুদ্ধিপ্রয়োগের ক্ষমতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র হ্রাস হতে থাকে। মননে–চিন্তায়ও তৃপ্তি আসে না। রুজি–রোজগার ও কর্মক্ষেত্রও সঙ্কুচিত হ'তে শুরু করে। কেবল কর্মক্ষেত্র নয়, খুব সংগঠিত যে সমাজ তার সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকা একেবারে গৌণ হয়ে যায়। এমনকি বিনোদনের মাধ্যমও প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত। ফলে সৃষ্টিশীল মানুষের কেবল দর্শকের ভূমিকা থাকে। এ সকল কারণ মানুষের মধ্যে অপারক্যবোধের জন্ম দিচ্ছে খুব বেশিরকম। সঙ্গে প্রবল মর্মবেদনাও। মুক্তধারা নাটকে রবীন্দ্রনাথ ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখ দিয়ে বলছেন–

মরমে মরমে বেদনা ফুটে
বাঁধন টুটে বাঁধন টুটে।

নাটকে ধনঞ্জয়ের সংগ্রাম রাজা রনজিতের সঙ্গে যতোটা নয় ততোটা প্রযুক্তিবিদ যন্ত্ররাজ বিভূতির তৈরি সেই যান্ত্রিক বাঁধটার বিরুদ্ধে। এই বাঁধ শিবতরাইয়ে প্রজাদের সর্বনাশে উদ্যত। ঐ বাঁধন যন্ত্রের বাঁধন। নাটকের নায়ক–প্রতিনায়কের লক্ষ্য সেই যন্ত্রের দিকে। এর পেছনে যে দর্শন তা উপেক্ষিত। তদুপরি বাঁধন দিলেই তো সমস্যা শেষ হবে না। এক বাঁধন অন্য কোনো সমস্যা আনবে কিনা বিবেচনা করা দরকার আগেভাগে। এ দায়িত্ব প্রযুক্তি নিয়ন্তার উপর দেয়া যায় না। বিজ্ঞানী দায়িত্ব নিলে নিশ্চিত থাকা যায়। মুক্তধারা নাটকে সামন্ততন্ত্রের কাঠামো অটুট। এ তন্ত্রের কল্যাণনীতি সমাজের হাতে গোনাদের জন্য। কাজেই শিবতরাইয়ের বাঁধন আপামর জনগণের কল্যাণ আনবে না। নাট্যকারের আশা যন্ত্রের বাঁধন টুটবে।

রক্ত করবীতে কবি আরো সরাসরি বক্তব্য রেখেছেন। সমস্যা প্রযুক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "আমার পালায় একটা রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ডু ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হলো না। আদি কবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষের হাত, পা, মুণ্ডু অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে, সেই শক্তিবাহুল্যের জোরে গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী, বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎ বজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করতো। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ন থাকতে পারতো। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন।

মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে।”

মানবকন্যার আবির্ভাব ঘটানো সম্ভব না হলে পৃথিবী যে সংকটে পড়েছে তার থেকে ত্রাণ পাবার উপায় নেই। রক্তকরবী নাটকে নন্দিনী লোভ ও শোষণের দুর্গে বন্দী রাজার দেয়াল ভাঙ্গায় সাহায্য করলেন। আধুনিক শোষণতন্ত্রের যিনি নায়ক হয়ে বসে আছেন তিনি কি নিজে নিজে সৃষ্টির মধ্যে বন্দী হয়ে যান ? এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরো স্পষ্ট উপসংহার টেনেছেন “একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে, আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ, সে আপনাকে আপনি পরাস্ত করে।”

মানবকন্যার আবির্ভাব যে অতি জরুরি তা যে কোনো মানবতাবাদী বিবেকবান মানুষ একবাক্যে স্বীকার করবেন। তাঁরা ভালো করেই জানেন, শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। রামেরা আজ স্ববৃত্তে নির্বাসিত হয়েও রেহাই পাচ্ছে না। তাদের বক্ষলগ্ন সীতাদের স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশাননরা কেবল সেকালে হরণ করে নি, এ কালে আরো চমৎকার কূটকৌশলে হরণ করছে। তখন তাদের সহায় ছিলো নিচু স্তরের প্রযুক্তি। আজ এসে গেছে রকেট, মিসাইল, আণবিক অস্ত্র, রবোট–এর মতো উন্নত প্রযুক্তি। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের প্রসারিত রূপ হলেও বিজ্ঞান যে দর্শনের সাহায্যে মানবকল্যাণে আবহমান কাল ধরে নিবেদিত হয়ে আসছে, প্রযুক্তি কিন্তু সে ধরনের ভূমিকা নিতে পারে নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য মানুষ স্পষ্টভাবে বুঝতে না পারায় মানুষ প্রযুক্তিকেই সর্বতোভাবে বিজ্ঞান মনে করছে। ফলে, বর্তমানে মানুষের মনে বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা বিপর্যয় ঘটছে। প্রযুক্তির উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব করার বেপরোয়া মনোবৃত্তি রোধ করা না গেলে বিজ্ঞানের সংকট আরো ঘনীভূত হবে এবং বিশ্বসভ্যতা হুমকির মুখোমুখি হবে।

বিজ্ঞান ও মানবিকতা

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উৎপাদনের মধ্যে মেলবন্ধন গড়ে তোলাই বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য। পূর্বে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও উৎপাদন স্বতন্ত্রভাবেই বিকশিত হচ্ছিল। পরস্পরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে সমাজ অগ্রগতিতে এ সকলের বাঞ্ছিত প্রভাব আশানুরূপ ফলাফল দিতে পারছিলো না। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উৎপাদনের মধ্যে সরাসরি ও নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনের ফলে উৎপাদনের ভারসাম্য রক্ষা ও গতি সঞ্চার করা সম্ভব হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবিত প্রসার ঘটেছে। উদ্ভাবনের নতুন নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এবং সমৃদ্ধি ও কার্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে নব উদ্ভাবিত ক্ষেত্রসমূহ আশাতীত ও অভূতপূর্ব সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। সে সঙ্গে বিজ্ঞানীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে ও অধিক গবেষণামূলক প্রকাশনা প্রকাশিত হচ্ছে। এ কারণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যয়ও অনেক বেড়ে গেছে।

তবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উৎপাদন একটি দেশের কল্যাণ ও অগ্রগতির ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারে না। আণবিক যুগে মানুষের বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা প্রদানও দুঃসাধ্য। বিজ্ঞান মানুষের বস্তুগত চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে অনন্য অবদান যেমন রাখতে পারে যেমন–তেমনি মানুষকে মহা সংকটেও ঠেলে দিতে পারে। প্রশ্ন হলো, আপনি কোনটিকে অধিক গুরুত্ব দেবেন। সুখের স্বর্গকে না নরকের আগুনকে ? মানুষই বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং একে সঠিক পথে চালনা করতে পারে। এই মানুষকে তা করার জন্যে সদিচ্ছা পোষণ করতে হবে। তাকে সত্যান্বেষী হতে হবে। তার সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। মানবকল্যাণে নিবেদিত এই মানুষদেরকে কিছুটা নির্মোহ ও নিস্পৃহ হতে হবে। তার মানবতার ও কল্যাণকামিতার শেকড় দৃঢ়বদ্ধ থাকবে যাতে কোনভাবেই তা শিথিল না হয়, নড়চড় না হয়। স্বীয় লক্ষ্যে অনড় থেকে তিনি চলমান জগতের সমস্যাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন ও সমাধান টানবেন। বৈজ্ঞানিক প্রয়াস আসলে সৃষ্টিশীল প্রয়াসের রকমফের মাত্র।

পূর্বেই বলেছি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উৎপাদন জাতীয় বিকাশে গতি দিতে পারে না এবং অগ্রগতিকে নিশ্চিত করতে পারে না যদি না তা গণমুখী হয়, গণকল্যাণে নিবেদিত

হয়। বিশেষ করে তা দরিদ্র ও বঞ্চিত জনসাধারণের জীবনকে সমৃদ্ধ করায় ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য আপামর জনগণের জন্যে খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র, চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাসহ জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের লভ্যতা নিশ্চিত করা, সবাই যেনো তা ভোগ করতে পারে তার দিকে দৃষ্টি রাখা। কাজেই বিজ্ঞান, ব্যাষ্টি মানুষের জন্যে নয়, বিজ্ঞান সমষ্টির জন্য। লাখো, কোটি মানুষের জন্যে।

এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উৎপাদনের মধ্যে চমৎকার বিজ্ঞানসম্মত সমন্বয় অত্যাবশ্যক। এটি করায় অনেক সমস্যা আছে। এটি একটি বড়সড় চ্যালেঞ্জ। চিন্তা, চেতনা ও লক্ষ্যে ফাঁক থাকলে কিংবা কপটতার আশ্রয় নিলে এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে উদ্ভাবন করেছে তার প্রতি প্রথমে গুরুত্ব প্রদান খুব জরুরি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, একাডেমি প্রভৃতিকে ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে অতি দ্রুত নিষ্ঠার সাথে শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

মানব ইতিহাস বর্তমানে গভীর সংকটের মুখোমুখি। এর আগে এই গ্রহে এতো বেশি লোভ–লালসা, ঘৃণা, জিঘাংসা ও সন্ত্রাস, হানাহানি ও হত্যা ছিলো না। সে সময় মানবিকতার অবক্ষয় ও অমানবিক কার্যকলাপ এতো বিস্তৃতি পায় নি। এসব মারাত্মক আকার নিয়ে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। মানবিক মূল্যবোধ একেবারে ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে। দরিদ্র ও সর্বহারা মানুষের আহাজারিতে গ্রহের বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। এক শতকের মধ্যে দুটো বিশ্বযুদ্ধ সংঘঠিত হয়ে গেলো। এর পর থেকে অঘোষিত যুদ্ধ চলছেই। এখন গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো এসেছে ড্রাগ ও এইডস এর অভিশাপ। গত দশকে আমেরিকার সর্বমোট সামরিক ব্যয় ২৯০ বিলিয়ন ডলার (মাথাপিছু আয়ের শতকরা ৬ ভাগ)। প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক ব্যয় ছিলো ২৫০ বিলিয়ন ডলার। সারা পৃথিবীর প্রতি বছরে সামরিক ব্যয় ১০০০ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশুর মাথাপিছু ২৫০ ডলার। প্রতি মিনিটের ব্যয় ২ মিলিয়ন ডলার। ভাবতে গা শিউরে ওঠে প্রতিটি নারী, পুরুষ ও শিশুর উপর ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা চালানোর জন্যে অস্ত্র নির্মাণ ও বিকাশে ব্যয় হচ্ছে মাথাপিছু ২৫০ ডলার! তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মানুষের মাথাপিছু গড় আয় ২৫০ ডলারের নিচে। তুলনা করলে দেখা যাবে শিক্ষা ও মানবকল্যাণের জন্য ব্যয় এর চেয়ে অনেক কম।

মর্মান্তিক সত্যি এই যে, সারা পৃথিবীতে বর্তমানে মানুষকে ভালোবাসার জন্য নয় বরং মানুষকে খুন করার জন্যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উৎপাদনের সামগ্রিক ফলাফল ব্যবহৃত হচ্ছে। এ বিপর্যয় থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব রয়েছে বিজ্ঞানীকুলের ও

একাডেমিশিয়ানদের। শিক্ষা, কেবল সুষ্ঠু শিক্ষা ও চেতনা দ্বারাই এই দুঃসময়কে অতিক্রম করা যেতে পারে।

১৯৪৫ সনের ৬ জুলাই থেকে ১৯৮৮ সনের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আণবিক বিস্ফোরণের একটা আনুমানিক হিসাব দেখা যেতে পারে। এই সময়সীমার মধ্যে আমেরিকা ৯১০, রাশিয়া ৬৩৬, যুক্তরাজ্য ৪১, ফ্রান্স ১৭২, চীন ৩১ ও ভারত ১ বার আণবিক পরীক্ষা করেছে। সর্বমোট ১৭৯০টি আণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। ১৯৬৩ সনের ৫ আগস্ট আংশিক পরীক্ষা বন্ধ চুক্তিতে স্বাক্ষরদানের আগে (বায়ুমণ্ডলের পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়) সর্বমোট ৫৪৭টি আণবিক বিস্ফোরণের মধ্যে ৪২৫টি বিস্ফোরণ ঘটানো হয় বায়ুমণ্ডলে।

মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির উপর জাতীয় বিকাশ নির্ভরশীল। গড় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি কিন্তু সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির স্মারক নয়। বিশেষ করে দরিদ্র জনগণের পক্ষে এ কথা বেশি খাটে। দরিদ্র মানুষের গড় মাথাপিছু আয় ভয়ানক অপ্রতুল ও হত্যাশাব্যঞ্জক। সব দেশে একই চিত্র। মানুষের এই দরিদ্রতার সাথে পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশ বিধ্বংস হওয়া সম্পর্কিত। সমৃদ্ধ দেশও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। সারা পৃথিবীর চালচিত্র একইরকম।

আমরা কিভাবে মানুষের পর্যায় নির্ধারণ করতে পারি, মানুষের কথা ভাবতে পারি এবং মানুষের বিপর্যয় অনুধাবন করতে পারি আমরা মানুষকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারি এবং তার সামর্থ্য বাড়াতে পারি? বিজ্ঞানীদের এতে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাদের নৈতিক দায়–দায়িত্বও রয়েছে। এর সমাধান সহজ নয়, তবে উন্নয়নের জন্যে তা গভীর গুরুত্ববহ। যে কোন দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রশ্ন সামনে এলে প্রথমে দৃষ্টি দিতে হবে দরিদ্র মা–বাবার শিশু সন্তানসন্ততির দিকে। আমরা দরিদ্র পরিবার বলতে তাকেই বোঝাতে চাচ্ছি যার মাথাপিছু গড় আয় জাতীয় মাথাপিছু গড় আয়ের এক পঞ্চমাংশ। সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ আমেরিকার কথা ধরা যাক। সেখানে শতকরা বিশভাগ শিশু সে সব পরিবারের, যেসব পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করে। এটি খুবই দুঃখজনক চিত্র। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের অবস্থা আরো ভয়াবহ। ইউনেস্কো প্রদত্ত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়ে সম্যক জানা যাবে। ১৯৯০ সনের ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিশু সম্মেলনে স্বীকার করা হয় যে, প্রতি সপ্তাহে আড়াই লক্ষ শিশু পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে এবং কোটি কোটি শিশু অপুষ্টিতে ভুগে স্থায়ী স্বাস্থ্যহীনতার শিকার হয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় আছে।

গত দশকে ১৫ লক্ষের অধিক শিশু যুদ্ধে মারা পড়েছে। ষাট লক্ষেরও বেশি শিশু পঙ্গু

হয়ে গেছে। কারো হাত-পা কেটে ফেলা হয়েছে, কারো মস্তিষ্ক বিনষ্ট হয়ে গেছে, কেউ শ্রবণশক্তি হারিয়েছে। এসব ঘটেছে বোমার আঘাতে, স্থল-মাইনের বিস্ফোরণে, গোলার আঘাতে এবং নিপীড়নের ফলে। যুদ্ধের কারণে ৫০ লক্ষ শিশু বর্তমানে আশ্রয় শিবিরে এবং এক কোটি বিশ লক্ষ শিশু গৃহহীন হয়ে পড়েছে। ১৯৯১ সনেও ৪০টি দেশে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং সেখানে অবোধ শিশুরা নানাভাবে নিগৃহীত হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শতকরা মাত্র ৫ ভাগ নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৫০ ভাগে। বিংশ শতাব্দীর শেষে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ এর শিকার হচ্ছে। এর বেশিরভাগই হচ্ছে নারী ও শিশু।

যুদ্ধের পরোক্ষ ফল আরো মর্মান্তিক। স্কুল ও চিকিৎসালয় হয় ধ্বংস, নয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। খাদ্য সরবরাহে সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আশ্রয় শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করছে। এ সবের পুরো ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে শিশুদেরকে। জীবনের প্রথমেই এ সকল শিশুর দেহ ও মনের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। শিক্ষা থেকে এরা বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে সমাজে তারা অবস্থান দখলের কৌশল ও দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না।

শিশুদের মানসিক আঘাতও বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা দরকার, মোজাম্বিকের গৃহযুদ্ধের একটা ছোট এলাকার পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, সেই এলাকার ৫০টি শিশু এতিম ও গৃহহীন, ৪২ জন মা অথবা বাবাকে হারিয়েছে। ১১টি শিশু তাদের মা বাবাকে খুন হতে দেখেছে বা শুনেছে, ১৬টি শিশু অপহৃত হয়েছে, এছাড়া প্রায় সব শিশুই ভীতসন্ত্রস্ত, অত্যাচারিত ও অনাহারক্লিষ্ট। দেশে দেশে যুদ্ধ ও দেশের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধের কারণে পৃথিবীর প্রায় ১ কোটি শিশু মানসিক রোগে ভুগছে।

এসবের মধ্যে লক্ষ লক্ষ শিশু বয়স্কদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে সর্বদা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। এই শিশুরাই তো ভবিষ্যতের পৃথিবী গড়বে। শারীরিক ও মানসিক পঙ্গু শিশুরা যে পৃথিবীকে গড়বে তার স্বরূপ কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে প্রসারিত করতে হলে সকল স্থায়ী অগ্রগতি ও বিকাশ এবং মানবিক মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অর্থাৎ আমাদের সমগ্র কর্মকাণ্ড নৈতিকতা দ্বারা পরিচালিত হবে। আণবিক যুগে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান শিক্ষার এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন ১৯৫০ সনে শিক্ষা বিষয়ে অবিস্মরণীয় উক্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মানুষের গুরুত্বপূর্ণ

প্রয়াসের মধ্যে অন্যতম হলো তার কর্মযজ্ঞকে নৈতিকতা দ্বারা পরিচালিত করা। মানুষের অন্তরের ভারসাম্য এমনকি মানুষের অস্তিত্ব এর উপর নির্ভরশীল। কর্মপ্রয়াসে কেবল নৈতিকতা আরোপিত হলেই মানুষের জীবন সুন্দর ও মহিমান্বিত হতে পারে। শিক্ষার সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব হলো নৈতিকতাকে চালিকা শক্তিতে পরিণত করে একে বিবেক পরিচ্ছন্ন করার কাজে নিয়োজিত করা। তিনি আরো বলেন, 'কোনো ঘরানা সৃষ্ট অবাস্তব দর্শনের উপর নৈতিকতার ভিত্তিকে নির্ভর করে তোলা সঠিক কাজ নয়। আবার কোনো অবাস্তব কাহিনী বা ঘরানার বৈধতা বিষয়ে সন্দেহ করাও সুষ্ঠু বিচার কাজের ভিত্তিকে বিপর্যস্ত করে দেয়।'

সব ধরনের উন্নয়নের ভিত্তির মূলে প্রধান উপজীব্য বিষয়গুলো হলো ঃ

১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বই, পত্রপত্রিকার ক্রমবর্ধমান মূল্য। ফলে তৃতীয় বিশ্বের লোকজনের পক্ষে তা সংগ্রহ করা অতি দুষ্কর।

২. স্কুলে অংকশাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিক্ষার নাজুক অবস্থা।

৩. জৈব-প্রযুক্তিগত বিপ্লব ত্বরান্বিত করায় বাধা।

৪. কম্পিউটার ও বৈদ্যুতিক মস্তিষ্কের যথাযথ ব্যবহার।

এসব বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। অপরিহার্য এই সকল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা লভ্য না হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা ও শিক্ষা কম অগ্রসর হতে পারে। 'নেচার' পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৯৫ পাউণ্ড, 'সায়েন্স'-এর ৩২০ মার্কিন ডলার। ফিজিক্যাল রিভিউ ৪০০০ মার্কিন ডলার এবং ফিজিক্যাল রিভিউ লেটারস ৮০০ মার্কিন ডলার। তৃতীয় বিশ্বের কয়টি গ্রন্থগারের পক্ষে এগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব ? আমেরিকা ও ইউরোপের বই, পত্রপত্রিকার দামের চেয়ে রাশিয়ার পত্রপত্রিকার দাম অবশ্য কম। কিন্তু তাও সংগ্রহে রাখার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সমস্যা আছে।

স্কুল শিক্ষা প্রসঙ্গে আসা যাক। অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়বস্তু পরিবর্তন ও প্রমিতকরণের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। স্কুল শিক্ষার ব্যাপারে সারা পৃথিবীতে সমস্যা রয়েছে। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়াস থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রথম শ্রেণীর গবেষণার মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ প্রণয়ন সম্ভব। বিখ্যাত অংকশাস্ত্রবিদ ও বিজ্ঞানী, স্কুল শিক্ষক ও ছাত্ররা অনবরত বিভিন্ন কর্মসূচিতে একত্রিত হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। জৈব-প্রযুক্তি ও কম্পিউটার বিজ্ঞানকে স্কুল শিক্ষা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করাও

আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষারও খোলনলচে বদলানোর প্রয়োজন আছে। তবে এ বিষয়ে ঠিক কি করা বাঞ্ছনীয় তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। যা করা দরকার তা কিভাবে সম্পাদন করা সম্ভব এ নিয়েও দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে। এক্ষেত্রেও গভীর ও কঠোর চিন্তাভাবনা প্রয়োজন।

বর্তমান বিশ্বের ভিত্তি হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। কাজেই অনেক আবশ্যকীয় ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব। কারণ অনেক বড় বড় আবিষ্কারের প্রকৃতি এমনি যে সেসব বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। সুতরাং পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন নমনীয় করে গড়তে হবে যাতে দ্রুত পরিবর্তনকে সামলে নিতে পারে। এটি করার জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষিত শিক্ষক প্রয়োজন। এই শিক্ষকরা দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হবেন এবং সৃষ্টিশীল ও মেধাসম্পন্ন হবেন। তাহলে এঁরা জাতীয় উন্নয়নে পরোক্ষ সহায়তা দানে সক্ষম হবেন। এ ধরনের শিক্ষক তৈরিতে সমর্থন সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রেরণা জোগাতে হবে।

পাঁচশ বছর আগে মুদ্রণযন্ত্র শিক্ষা ও সমাজ পরিবর্তন আনয়নে যে ভূমিকা পালন করেছিলো তার চেয়ে গভীর ভূমিকা পালন করছে কম্পিউটার। জৈব-প্রযুক্তি ও কম্পিউটার সৃষ্ট বিপ্লব প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের অবতারণা হতে পারে। এই প্রশ্নকে অতীতে সাধারণত অবজ্ঞা করা হতো। এমনকি বর্তমানেও করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও তা করা হতে পারে। অথচ প্রশ্নটি আমাদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত। এটি সব প্রশ্নের সেরা প্রশ্ন। এটি বিজ্ঞান, দর্শনসহ অন্য সকল বিদ্যার গোড়ার প্রশ্ন। এটি ব্যষ্টি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নের মূল প্রশ্ন।

প্রশ্নটি হলো–আমি মুক্ত। কতিপয় ক্ষেত্রে আমার ইচ্ছানুরূপ কাজ করতে পারি এবং আমার কাজের জন্য আমাকে জবাবদিহি হতে হবে। দায়িত্ব নিতে হবে। অথবা আমার দেহ অণু–পরমাণু দিয়ে গঠিত। আমার সমদুয় কাজ সময়, বস্তু ও শক্তির কাছে পুরো জবাবদিহি করায় বাধ্য? আমার সকল কর্মকাণ্ড নিয়তি–নির্ভর ও অপ্রত্যাশিত। অণু–পরামাণুর সমাহার, যা একটা মেশিনে ঘটে থাকে। তার কোনো স্বাধীনতা, কোনো পছন্দ, কোনো সৃষ্টিশীলতা থাকে না। প্রশ্নটির মূল প্রতিপাদ্য হলো। মানুষ যন্ত্র নয়। তার পছন্দ অপছন্দ আছে। সে স্বাধীনতভাবে কাজ করতে চায়। সে তার সৃষ্টিশীল মেধাকে কাজে লাগাতে চায়। এর জন্যে পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। যন্ত্র মানুষকে পরিচালিত করবে না। মানুষই যন্ত্রকে সৃষ্টিশীলভাবে কাজে লাগাবে। যন্ত্রের স্বকীয় মেধা নেই।

যদি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়ন জনগণের প্রকৃত প্রয়োজন ও স্বার্থের সেবা করতে চায় তাহলে সাহসী, কুসংস্কারমুক্ত ও কঠোর চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। সর্বোপরি এ জন্যে স্থির দৃঢ় সংকল্প ও সামাজিক অঙ্গীকার থাকা বাঞ্ছনীয়। অবিজ্ঞজনোচিত উন্নয়ন পরিবেশে অবাঞ্ছিত ক্ষতি করতে পারে এবং নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

সঠিক বা বিজ্ঞজনোচিত উন্নয়নের সংজ্ঞা দেয়া সহজ নয়। তা বাস্তবায়নও সহজ নয়। শিক্ষার ব্যাপারটা আমরা বিবেচনা করতে পারি। সবাই অনুভব করেন যে, শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন জরুরি। কিন্তু পরিবর্তনের বিষয়টি আমাদের কাছে অস্পষ্ট। কি করা উচিত এবং কিভাবে পরিবর্তন বাস্তবায়ন করা যায় সে ব্যাপারে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারি না। সম্মেলন করে আমরা সঠিক উন্নয়নের ব্যাপারে তত্ত্ব ও প্রয়োগের ব্যাপারে পারস্পরিক মত বিনিময় করতে পারি, প্রেরণা পেতে পারি। এভাবে মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারি। অবিরাম এ ধরনের কর্মসূচি চালিয়ে যেতে পারলে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

আণবিক যুগে মহাত্মা গান্ধীর বাণী স্মর্তব্য। তিনি বলেছিলেন, 'কোনো পরিকল্পনা গ্রহণের সময় দরিদ্রতম ও দুর্বলতম মানুষের মুখগুলোর দিকে দৃষ্টি রাখো। তোমরা যা করতে চাচ্ছো তা তাদের কোনো কাজে আসবে কিনা ভেবে দেখো। তারা কি এর দ্বারা উপকৃত হবে? তারা কি তাদের জীবন ও ভাগ্যকে এর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে ? অন্য কথায়। ক্ষুধার্ত, অনাহারক্লিষ্ট কোটি কোটি মানুষ স্বাধীনভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে' ?

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়নের অপরিসীম ক্ষমতা ও সম্ভাবনা আছে। এটি অভূতপূর্ব ও অপ্রতিরোধ্য হাতিয়ার। যথার্থভাবে প্রয়োগ করলে জ্ঞান, সুখ ও বিজ্ঞতার ক্রমোন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত হবে। অযথার্থ প্রয়োগে এই আণবিক যুগে সারা পৃথিবীতে দুঃখকষ্ট বাড়াবে ও ধ্বংস ডেকে আনবে।

জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এসব মানুষকে চরিত্র গঠনে ও মানুষের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে সহায়তা করে। চরিত্র গঠন ও সত্যিকার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়ন পাশাপাশি ঘটতে পারে। একে অন্যের পরিপূরক হয়ে দৃঢ়বদ্ধ হতে পারে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শাসিত পৃথিবীতে সমগ্র স্তরে শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানই হবে দরিদ্র জনগণের প্রতি অঙ্গীকার ও ভালোবাসার প্রমাণ। শিক্ষা জনগণের মধ্যে

BANSDOC Library
Accession No. 16455

উদ্দীপনা জাগাবে, তাদের জীবনাচরণ পদ্ধতি ও প্রয়োজন সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করবে; উৎপাদনশীল কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে এবং তাদেরকে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশী করে তুলবে। জীবন ও কর্মে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের দর্শনকে চালিকা শক্তি হিসেবে কীভাবে ব্যবহার করবে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা সৃষ্টি করবে। বিজ্ঞানের সংহারক ভূমিকাকে সৃষ্টিশীল ভূমিকায় যে রূপান্তর করা সম্ভব তা তখন জনগণ বুঝতে পারবে। মানবতার সপক্ষে বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ও আবিষ্কারকে ব্যবহারে সমগ্র জনগণ অনুপ্রাণিত হবে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়নের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ও ভারসাম্য রক্ষা করে নতুন পৃথিবী গড়ায় ওরা এগিয়ে আসবে। বিজ্ঞান সমষ্টির জন্য। ব্যক্তির জন্য নয়। বিজ্ঞানের মহাযজ্ঞে আপামর জনসাধারণ অংশ না নিলে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর সাধনা কাঙ্ক্ষিত ফল প্রসব করতে পারবে না।

গ্রামীণ মানুষে বিজ্ঞান–মনস্কতা সৃষ্টি

"কলা রুয়ে না কেটো পাত,
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।"

খনার এ বচনে গ্রামের মানুষের লব্ধ অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন ঘটেছে। জনপদে ছড়িয়ে থাকা বচন ও প্রবচন মানুষের দৈনন্দিন জীবন–পরিক্রমায় অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। কলা গাছের পাতা কেটে ফেললে গাছে যে ফলন কম হয় তা সাধারণ মানুষ বহুদিন আগে থেকে জানতেন এবং এখনো বৃদ্ধেরা জানেন। তবে নতুন প্রজন্মের কাছে এ বিষয়গুলো ক্রমেই গুরুত্ব হারাচ্ছে অথবা ওরা এ ব্যাপারে ওয়াকেবহাল হতে পারছে না। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির যুগেও এ সকল বিষয়ের অপরিহার্যতা কমে যায় নি। বরং এগুলো আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়ক ও পরিপূরক উপাদান হিসেবে অর্থবহ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে স্মরণ রাখা দরকার যে কোনো লৌকিক বিশ্বাস সমাজের উপকারে এলেও একে বিজ্ঞান-মনস্কতা বা বিজ্ঞান বলে মেনে নেয়া যায় না।

আগে মানুষ একটা গাছ কাটার আগে বেশি না হলেও একটা গাছ লাগাতেন। মানুষ বিশ্বাস করতেন গাছ না লাগিয়ে গাছ কাটলে বংশের কারো ক্ষতি হবে। কেউ এটাকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু এই সংস্কার যে পরিবেশ সংরক্ষণের সহায়ক তা তো বিশ্বাস করবেন। আধুনিক বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে এ কথাটি নব প্রজন্মের জনগণকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারলে আরো ভালো হয়। গ্রামে প্রচলিত বিশ্বাস—রাতে গাছের ফল, ফুল, পাতা ছিঁড়তে নেই। ছিঁড়লে কি হবে ? জবাব, ক্ষতি হবে। কি ক্ষতি তা কিন্তু কারো জানা নেই। মানুষ সরলভাবে তা বিশ্বাস করেছে এবং রাতে গাছে পারতপক্ষে হাত দেয় নি। আধুনিক বিজ্ঞানের বদৌলতে আমরা জানতে পেরেছি যে গাছেরও বিশ্রাম দরকার। রাতে তার জৈবিক কর্মকাণ্ডে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন কম হয়। রাতে মহা বনস্পতির নিচে বা ডালে থাকা বারণ ছিলো। মানুষ সে নিষেধ মানতো সংস্কারের বশে। সরল বিশ্বাসে। নিষেধ না মানলে যদি কোনো ক্ষতি হয়! গাছ দিনে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই–অক্সাইড

গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। গাছ নিজদেহে খাদ্য তৈরি করার সময় এ প্রক্রিয়া ঘটায়। গাছ আবার দিনে শ্বসনের কাজে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং অল্প কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়ে। কিন্তু রাতে গাছ শ্বসনের জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করলেও বেশি পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইডই ছাড়ে। কারণ গাছ রাতে খাদ্য তৈরি করে না। খাদ্য তৈরিতে যে প্রধান উপাদান প্রয়োজন তা রাতে পাওয়া যায় না। প্রধান উপাদানটি হলো সৌররশ্মি। বৈজ্ঞানিক কারণ না জেনেও নিষেধ মানাতে মানুষের কোনো ক্ষতি হয় নি। যে মানুষটি প্রথম এই নিষেধের বাণী দিয়েছিলেন তিনি নিশ্চিতভাবে এর বৈজ্ঞানিক কারণ সম্পর্কে জানতেন। সে সময়কার মানুষের বৈজ্ঞানিক কারণের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য হয়তো মানসিক প্রস্তুতি বা শিক্ষা-দীক্ষা ছিলো না। তাই, তিনি এমনিতে নিষেধ বাক্য দিয়েছিলেন। মানুষটি সমাজপতি বা ধর্মগুরু গোছের কেউ ছিলেন। তাঁর কথা সবাই মানতো।

গোটা শ্রাবণ মাস জুড়ে হিন্দু সম্প্রদায় সাপের দেবী মনসার পূজো করে। এই মাসে সাপ মারা নিষেধ। এক কথায় এ মাসটি সাপ পূজোর মাস। এটি একটি অন্ধ বিশ্বাস। কিন্তু এ বিশ্বাস সমাজের জন্য উপকারী। বর্ষা সাপের প্রজনন ঋতু। ডিমধারণকারী সাপ হয় শ্লথ গতির। একটি ছোট ছেলেমেয়ের পক্ষেও একটি বড় সাপ মারা সহজ। নির্বিচারে সাপ মারা পড়লে সাপের বংশবৃদ্ধি হবে না। কৃষি অর্থনীতি নির্ভর গ্রামীণ সমাজের জন্য আষাঢ়-শ্রাবণ মাস এদেশে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের প্রধান ফসল ধান ও পাট এসময়েই ফলে। ফসলের মাঠে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ ঘটে। ফসল ঘরে তোলার পর ইঁদুরের উৎপাত স্বাভাবিক ঘটনা। সাপ পোকা-মাকড়, ইঁদুর খায়। ফলে মাঠে ও ঘরে ফসল রক্ষা পায়। গ্রামের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত মানুষকে এমনিতে সাপ না মারার উপদেশ দিলে শুনতো না। ধর্মীয় বিধিনিষেধ থাকার ফলে মানুষ তা মেনে এসেছে।

এখন গ্রামে শিক্ষার হার বাড়ছে। ফসল রক্ষা ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে সাপের ভূমিকা বোঝানো গেলে নিশ্চয়ই তারা বুঝবে। এখন ধর্মীয় ছদ্মবেশের প্রয়োজন পড়বে না।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজে এখনো বনস্পতি পূজো চালু আছে। বট, অশ্বত্থের গায়ে এখনো সিঁদুর মাখানো হয়। বনস্পতি পূজোর বিধান যিনি দিয়েছিলেন তিনি নিঃসন্দেহে একজন বড়ো মাপের প্রকৃতি বিজ্ঞানী। একটি বনস্পতি তীব্র দাবদাহের সময় সুশীতল ছায়া দেয়। তাঁর পাতা ও মরাকাঠ পচে জৈব সার হয়। তার বিশাল দেহে আশ্রয় নেয় পাখ-পাখালি। গাছের ফল খেয়ে ওদের উদরপূর্তি ঘটে। ছায়াবৃত

চারপাশের জমি উর্বরতা হারিয়ে উষর ভূমিতে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। গাছ প্রচুর অক্সিজেনের সাহায্যে আশপাশের বাতাসকে নির্মল রাখে। বনস্পতিকে পূজো দেয়ার বিধান চালুর উদ্দেশ্য একে যেনো কেটে ফেলা না হয়। একটি লাল গোলাপের জন্য লড়াইয়ের চেয়ে একটি গাছের জন্য লড়াই কম বিবেচনার নয়। বনস্পতির উপকারিতার কথা আমরা এখন বিজ্ঞানের আলোকে মানুষকে বোঝাতে পারি। পূজো করা অন্ধ বিশ্বাস–একশোবার মানি। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা না করে সে বিশ্বাসকে ভেঙে দেয়া কতখানি যুক্তিযুক্ত তা ভাবার বিষয়।

শ্রাবণ মাসেই হাল–পাড়ানি বলে একটা কথা চালু আছে কোনো কোনো জনপদে। লোকবিশ্বাস, এ সময় ধরণী ঋতুবতী হয়। পূর্বে প্রায়ই দেখা যেতো এসময় প্রবল বর্ষণ হয়। সময়টা সম্ভবত আষাঢ়–শ্রাবণের কোন এক অমাবস্যার কাছাকাছি দিনগুলোতে। গ্রামের চাষীরা এ সময় হাল কর্ষণ করে না। জেলেরা নদী–সমুদ্রে পুরো পক্ষ জুড়ে মাছ মারতে যায় না। অন্ধ বিশ্বাস, মাছ ধরতে গেলে নিজের বা বংশের কারো ক্ষতি হবে, নয়তো মারা যাবে। হিসেব করে দেখা গেছে, এ সময়টাতে মাছেরা প্রজনন ঘটায়। ডিম্বধারণকারী মাছ মারা পড়লে মাছের আকাল দেখা দেবে পরের বছর। এখন পত্র–পত্রিকা, রেডিও টেলিভিশনে ডিমওয়ালা মাছ না মারার জন্য, ৬ ইঞ্চির নিচের মাছ না ধরার জন্য কতো ঢাকঢোল পেটানো হচ্ছে। কেউ তাতে কান দিচ্ছে কি ? তাহলে অন্ধবিশ্বাস কি ভালো ছিলো ? এ–এক জটিল প্রশ্ন। অন্ধবিশ্বাসের *বিকল্প হিসেবে বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি আনুগত্য আদায় করতে না পারা পর্যন্ত* নিজেদের স্বার্থে অন্ধবিশ্বাস টিকিয়ে রাখা বাঞ্ছিত কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়। অবশ্য গ্রামের মানুষের মধ্যে এখন সত্যিকার অর্থে বিজ্ঞান চিন্তার প্রসার ঘটাতে পারলে হয়তো সুফল ফলবে। বিজ্ঞানের যা কিছু চর্চা ও প্রসার তা তো নগরকেন্দ্রিক। বিজ্ঞানকে গ্রামে সহজভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস এতোই অকিঞ্চিৎকর যে, তা উল্লেখ না করলেও চলে।

বাংলাদেশের গ্রামে–গঞ্জের সাধারণ মানুষ বহুকাল থেকে বিরাণ মাঠে রাতের শেষ প্রহরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে, শস্য ক্ষেত্রের আলে বা গর্তে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতো। এখনো অনেক গ্রামের অধিকাংশ স্থানে এ প্রথা চালু আছে। বর্ধিষ্ণু পরিবারে কেবল পায়খানা ঘর চালু আছে। এ সকল জৈবসার ফসল উৎপাদনে কিছু ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতো, এখনো করছে। জনস্বাস্থ্যের প্রতি তা কিছুটা হুমকিও ছিলো। জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তার কথা ভেবে সিমেন্টের এক ধরনের পায়খানা নির্মাণের পদ্ধতি চালু করা হলো। এ সবের জন্য যে পরিমাণ অর্থের দরকার তা যোগান দেয়া সাধারণ

নিম্নবিত্তের মানুষের সম্ভব হলো না। যাদের পক্ষে এ প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হলো সেখানে অন্য সমস্যা দেখা দিলো। বৃষ্টির পানি রোধ করা এবং দুর্গন্ধ নিবারণ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। তদুপরি স্বল্পসময়ে এ পায়খানা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে যেহেতু তা ভরে যায়। এই মূল্যবান জমানো জৈবসার ব্যবহারের কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে উঠলো না। মলজাত জৈবসার কি উপায়ে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে বাড়তি ফসল উৎপাদন সম্ভব এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা করা সম্ভব তা ভেবে দেখা অত্যাবশ্যক।

বর্ষার শেষে শরতের শুরুতে মাঠ, খাল–বিলে পানি শুকিয়ে এলে ডাঙ্গায় পোকা–মাকড় সংখ্যায় বাড়ে। দেয়ালি বা দ্বীপান্বিতা পূজোয় রাতে প্রচুর আলো জ্বালানো হতো। তাতে ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা মারা পড়তো। এটা আধুনিক লাইট–ট্র্যাপ পদ্ধতির মতো। মানুষ পূজোর অছিলায় পোকামাকড় নিধনের প্রতীক হিসেবে একে ব্যবহার করতো। পোকামাকড় ফসলের ক্ষতি করে। কাজেই, লাইট–ট্র্যাপিং বিষয়ে সাধারণ মানুষকে প্রশিক্ষিত করা কঠিন কাজ নয়।

চৈত্র মাসের শেষে বাড়ির আনাচকানাচ ভালো করে পরিষ্কার করে আবর্জনা, পাতা ইত্যাদি জড়ো করা হতো। তাতে বিষ কাঁঠালি, নিম ও অন্যান্য ভেষজ বৃক্ষ ফেলে আগুন জ্বালানোর উৎসব করা হতো। প্রজ্বলিত আগুন ও ধোঁয়ার আঁচ গায়ে লাগানো হতো এবং সুর করে গান ধরা হতো। বলা হতো এ গাঁয়ের ব্যাধি অন্য গ্রামে যা, সাত সমুদ্দুর পার হয়ে যা ইত্যাদি। অর্থাৎ এটা যেনো ব্যাধি নির্মূল করা বা তাড়ানোর উৎসব। আসলে বাড়ির আশপাশ পরিচ্ছন্ন করাই ছিলো এর মূল উদ্দেশ্য। সঙ্গে ভেষজ উদ্ভিদ ভস্ম নির্গত ধোঁয়া শরীরের কোনো উপকারে আসে কিনা গবেষণা করা যায়। এ সময় ঘরের ভিতরও সাফসুরৎ করা হয় এবং বাসনকোসন, কাঁথা ও কাপড়চোপড় ধুয়ে ফেলা হয়। লক্ষ্য করুন, বাংলাদেশে এ সময়টাতেই বেশিরভাগ সময় কলেরা, ওলাওটা, বসন্তের প্রকোপ হতো। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে এ সকল আধিব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ। বর্তমানে গ্রামগঞ্জের মানুষকে আমরা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সজাগ করে তুলতে পারি।

গ্রামের মানুষ আগে শ্রীপঞ্চমী বা স্বরস্বতী পূজোর আগে কুল খাওয়া বারণ করতো। কারণ অনেকের জানা ছিলো না। ছেলেমেয়েরা নিষেধ মানতো। দেখা গেছে এসময় কুল সর্দি–কাশের প্রকোপ সৃষ্টি করে। এ সময় প্রায় ঘরে ছেলেমেয়েদেরকে জোর করে তেতো চিরতার পানি, আনারসের কচি পাতার রস, চুনের পানি খাওয়ানো হতো। পেট ভালো রাখা ও কৃমির উপদ্রব থেকে রক্ষা করাই ছিলো এর উদ্দেশ্য।

কিন্তু তারা জনস্বাস্থ্যের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি নজর দিতো না। তা হলো হাত পরিষ্কার করে খাওয়া, ফুটানো পানি বা দাবা কলের পানি খাওয়ার ব্যাপারে ছেলে–মেয়েদের সতর্ক করা। তারা নিমপাতা খাওয়াতো ও নিমপাতা সেদ্ধ দিয়ে স্নানও করতো। চর্মরোগ যাতে না হয় তার জন্য এ ব্যবস্থা। তবু চর্মরোগ থেকে রেহাই ছিলো না, যেহেতু দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক থাকতো না। এটি যে নীরোগ স্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম অপরিহার্য শর্ত এ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে বোঝানো দরকার।

জনবিস্ফোরণ রোধে সরকার জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের সহায়তায় নানা ধরনের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। এতেও উদ্দিষ্ট লক্ষ্যভেদে সফল হচ্ছেন না। সফল না হবার অন্যতম কারণ দুটি ঃ ১. সরকারি কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন করলেও বেতন পাবেন, না করলেও পাবেন। তাঁরা দায়িত্ব হিসেবে যেটুকু করার করেন। এখানে আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার প্রবল অভাব রয়েছে। এ কাজে নিয়োজিত কর্মীদের সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে। ওদের সাথে সখ্যের রাখীবন্ধন গড়ে তুলতে হবে। বন্ধু বন্ধুর কাছে মন খুলে কথা বলে, তার সমস্যার অবগুণ্ঠন খোলে। সাধারণ মানুষ শহুরে মিয়া–বাবুদেরকে, সরকারি কর্মচারীদেরকে বন্ধু ভাবে না। ২. প্রয়োজনীয় উপকরণ লভ্য না হওয়া। সাধারণ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। একটা বড়ি বা কনডমের জন্য বাড়তি অর্থ জোগানো তাদের জন্য কষ্টকর। তাদের হাতের কাছে এ সকল উপাদান সবসময় যাতে লভ্য হয় সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে। কেবল সন্তান উৎপাদন বন্ধ করার পরামর্শ অনেক সময় বিপরীত ক্রিয়া করে। আগে তার সমস্যা বুঝতে হবে। তার সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতে হবে। সন্তান উৎপাদনের সাথে স্বাস্থ্যসমস্যা ও অর্থসমস্যা কিভাবে জড়িয়ে আছে তা তাকে বুঝতে দিতে হবে। তাদের মনে যে বদ্ধমূল ধর্মীয় বিশ্বাস আছে তাকে যুক্তি ও উদাহরণের মাধ্যমে অপসারণ করতে হবে। সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া যাবে না। তাতে কাঙ্খিত ফল আসে না। তার মনোভূমি কর্ষণ করে তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করা দরকার। সিদ্ধান্ত নেবার পর তার কাছে প্রয়োজনীয় উপকারণ লভ্য হতে হবে। তারপর সুফল লাভের আশা করা যায়।

গ্রামের বা শহরের সাধারণ মানুষকে একটা লুঙ্গি ও কিছু সামান্য অর্থ বা একটা কাপড় সাহায্য দিয়ে বন্ধ্যাকরণে উদ্বুদ্ধ করা যায় না। ওদের জীবনের সমস্যা বুঝতে হবে। সাধারণ একজন কৃষক মনে করে তার পাঁচ ছয়টি সন্তান থাকলে তাকে কৃষিকাজে বা কুটির শিল্পে সাহায্য করতে পারবে। কাজেই, বেশি সন্তান উৎপাদনকে সে লাভজনক

মনে করে। এছাড়া বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবলম্বন পুরুষ সন্তান। তাকে যদি বোঝানো যেতো যে একটি সন্তানের পেছনে যে ব্যয় হয় এবং বেশি সন্তান ধারণের ফলে তার স্ত্রীর দেহের যে ক্ষতি হয় তার হিসাব খতিয়ে দেখলে আসলে তার ক্ষতির পাল্লাই ভারী হয়। সে যদি তার লাভক্ষতির ব্যাপারটিকে ঠিকমতো বুঝতে পারে তবে সে একটা লুঙ্গি বা শাড়ির তোয়াক্কা করবে না। বোঝানোর এ দায়িত্বটা সরকারি বেতনভুক কর্মচারীর পক্ষে সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া ঝড়, বন্যা, অনাবৃষ্টি, খরা, পোকামাকড়ের উপদ্রবজনিত কারণে ফসলহানি, রোগ–শোকের কারণে প্রার্থিত ফসল উৎপাদনে ব্যর্থতা, মহাজনী সুদের নিষ্পেষণের কারণে ক্লিষ্ট কৃষক ও কুটির শিল্পীদের জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা করা গেলে, তাদের ছেলেমেয়েদের ন্যূনতম পড়াশোনা, স্বাস্থ্যরক্ষা, কাপড়চোপড়ের সংস্থান করা গেলে এবং বৃদ্ধবয়সে বেঁচে থাকার ন্যূনতম সংস্থানের ব্যবস্থা হলে তারা আশ্বস্তবোধ করতো এবং বন্ধ্যাকরণ বা সন্তান উৎপাদন নিরোধের অন্য ব্যবস্থা বিষয়ে কর্ণপাত করতো সহজে। আমরা তাদের জীবনের মূল সমস্যাগুলোকে পাশ কাটিয়ে যে সব সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেই এবং অনুসরণে চাপ সৃষ্টি করি তা অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ি জোড়ার মতো। তাতে রথ ও রথী দুই–ই মারা পড়বে। সমস্যার সুরাহা হবে না।

এদেশে যৌন স্বাস্থ্য ও যৌন রোগ বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ। এমনকি এ বিষয়টি নিয়ে কেউ প্রকাশ্যে আলোচনা করতেও সঙ্কোচবোধ করে। অথচ বাংলাদেশের বিপুল নারী ও পুরুষ এই ঘাতক ব্যাধিতে ভোগে। এই ব্যাধি সংক্রমণের মূল কারণ যৌন বিষয়ে অসচেতনতা ও অসতর্কতা। উন্নত দেশসমূহে স্কুল পর্যায়ে যৌন শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা আছে। এদেশে এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। সবাই এটা স্বীকার করেন যে যৌনাঙ্গ মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই অঙ্গের সুস্থতার উপর মানবসমাজের সুস্থতা নির্ভর করে। একটি সমাজকে সুস্থ, সবল, নিরোগ প্রজন্ম উপহার দিতে হলে এই অঙ্গ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা ও নির্দেশনা থাকা অতি জরুরি। শহরাঞ্চলে লোক যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে প্রথমে কিছু টোটকা চিকিৎসা নিজেরাই নিয়ে থাকে। অধিকাংশ সময় ওরা আনাড়ি তথাকথিত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। তাতেও যখন রোগমুক্তি ঘটে না তখন কিছু কিছু রোগী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়। অন্যরা ধুঁকে ধুঁকে মরে। অসুস্থ এই যৌন রোগীরা অসুস্থ সন্তানের জন্ম দেয়।

গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আরো করুণ। গ্রামে বিশেষ করে মেয়েরা সবচেয়ে অসহায়। এরা পারতপক্ষে মুখ খোলে না। রোগযন্ত্রণা যখন একেবারে সহ্যের বাইরে যায় তখন

ওরা বলতে বাধ্য হয়। ততোদিনে রোগ অনেক জটিল আকার ধারণ করে। গ্রামে যৌন বিষয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার মিলে কালেভদ্রে। ফলে ওরা বিনা চিকিৎসায় নিদারুণ কষ্ট পায় অথবা অকালে ঝরে যায়। রোগাক্রান্ত শরীর নিয়ে গর্ভধারণ করে এবং অসুস্থ সন্তানের জন্ম দেয়।

গর্ভধারণ, সন্তান পালন বিষয়ে গ্রামের মহিলাদের কোনো প্রকারের শিক্ষা নেই বললেই চলে। কিশোরীরা প্রথম ঋতুস্রাব বিষয়ে আগে থেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে না। হঠাৎ করে রক্তস্রাব শুরু হলে তাদের মধ্যে নানা ধরনের মানসিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রতিক্রিয়ার ভয়াবহতা তাদের মনে দীর্ঘক্রিয় থাকে। অনেক মেয়ে সারাজীবন এর কুফল বয়ে বেড়ায়।

এ সব কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে পারিবারিক শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার। সরকার পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা নিতে পারতেন। সেক্ষেত্রে আগে পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের যৌন বিষয়ে প্রশিক্ষণদান আবশ্যক। এনজিও–রা পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের একাংশকে ব্যবহারের জন্য সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন বা নিজেরা স্বতন্ত্র প্রকল্প নিয়ে কাজ করতে পারেন।

চর্মরোগের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ অবস্থা সর্বত্র বিরাজ করছে। চর্মরোগে কুচিকিৎসা, অপচিকিৎসা চলছে নির্বিচারে। চর্মরোগ এদেশে প্রায় ঘরে ঘরে। অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় চর্মরোগ চাপা পড়ে নানা ধরনের জটিল রোগের সৃষ্টি হয়। এসবের মধ্যে পেটের রোগ সর্বাধিক। চর্মরোগ চাপা পড়ে ক্যান্সার পর্যন্ত দেখা দিতে পারে বলে জানা যায়। বিজ্ঞানী হ্যানিম্যান চর্মরোগকে "হাজারো মাথা দৈত্য" নামে অভিহিত করেছিলেন। এই দৈত্য মানব শরীরে হাজারো রোগের আকারে প্রকাশ পেয়ে থাকে। চর্মরোগে যাতে আক্রান্ত না হয়, আক্রান্ত হলেও যাতে সুকিচিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণের উপায় বিষয়ে জ্ঞানদান অপরিহার্য। এনজিও কর্মীরা তাঁদের দৃষ্টি এদিকে প্রসারিত করতে পারেন।

বনসৃজন, বনসৃজনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব, বন–সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে প্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ, গ্রীন হাউজ এফেক্ট, জৈবসার ও জৈবশক্তি উৎপাদন, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা ও পারিবারিক শিক্ষা, গণশিক্ষা, সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রামীণ কুটির শিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন, জলবায়ু ও আবহাওয়া বিষয়ে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ, বন্যা বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা ও কোন্ ধরনের মাটিতে কোন্ ধরনের ফসল উৎপাদন সম্ভব, পুষ্টি বিষয়ক ধারণা সৃষ্টি,

জ্বর–সর্দি–কাশ, ডায়রিয়া, কৃমি, হাম, জলবসন্ত বিষয়ে প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ, বিচ্ছু, সাপে কাটা, কুকুরের কামড়ের প্রাথমিক চিকিৎসা, গৃহপালিত পশু–পাখির রোগ ও প্রতিকার বিষয়ে সাধারণ আলোচনা, হাঁস–মুরগীর খামার, দুগ্ধখামার, গরু–ছাগল পালন, মৎস্য খামার, চিংড়ি চাষ ইত্যাদি বিষয়ে এনজিও–রা নানা ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেন।

বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে কোনো কোনো এলাকায় ছোটখাট বিজ্ঞান–ক্লাব গড়ে উঠছে। এ ছাড়া নানা ধরনের সামাজিক সংগঠন তো আছেই। এদের মাধ্যমে উপরিলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণের কথা ভাবা যেতে পারে। বিজ্ঞান–ক্লাব বা সামাজিক সংস্থার সদস্যরা সার্বক্ষণিকভাবে এ কাজে সময় দিতে পারবেন না। সার্বক্ষণিক নিয়োগ করা হলে তাতে অর্থব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যাবে। তাঁদের খণ্ডকালীন নিয়োগের বিষয়টি প্রথম দিকে অগ্রাধিকার পেতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করার পর পরবর্তীকালে পূর্ণ সময়ের জন্য কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়।

গণশিক্ষার উদাহরণ ধরা যাক। বিজ্ঞান–ক্লাব বা সামাজিক সংগঠন–এর সদস্যবৃন্দ নিজেরা প্রথমে এ কাজটি শুরু করবেন। একজন সদস্য একজন নিরক্ষর লোককে এক মাসের মধ্যে স্বাক্ষর করে তুলবেন। এ দৃষ্টান্ত অন্য শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে উৎসাহিত করবে। ক্লাব বা সংগঠন এখানে motivator হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। ক্লাব, সংগঠনের কোনো কর্মকর্তাকে এর জন্য কোনো অর্থ প্রদান করা হবে না। ক্লাব সংগঠনকে তাদের অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য একটা অনুদান প্রদান করা যেতে পারে।

তাঁত, বেতের কাজ, নকশীকাঁথা, বাটিক, ছাপা শাড়ি, কাঠের সামগ্রী, রেশম বস্ত্র, পাটের জিনিসপত্র, চর্মজাত জিনিস প্রভৃতি শিল্পকর্মের সাথে জড়িত শ্রমিকদের সাবেকী শিক্ষায় পরিবর্তন আনা অপরিহার্য। বর্তমানে কুটির শিল্প-সামগ্রী দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাইরে রফতানি হচ্ছে। এ সব শিল্পকর্মে আধুনিক প্রযুক্তি ও ধ্যানধারণার প্রসার ঘটাতে পারলে তারা বেশি লাভবান হবে। এদেরকে সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব বিষয়েও বোঝাতে হবে। সমবায় যে তাদের বিপদের বন্ধু এবং তাদের স্বার্থরক্ষার ন্যায্য প্রতিষ্ঠান সে বিষয়ে তাঁদের মনে বিশ্বাস ও আস্থা জন্মাতে হবে।

মানুষ একান্ত অসহায় হলে সে নিয়তির কাছে নিজেকে সঁপে দেয়। চিকিৎসার সুব্যবস্থা থাকলে কেউ দোয়া, তাবিজ, পানিপড়া, স্বপ্নে প্রদত্ত ওষুধ, পীর-ফকির, সাধু ভণ্ডের আশ্রয় খুঁজবে না। এন্টিভেনম ইনজেকশান সহজলভ্য হলে মানুষ সাপের ওঝার দ্বারস্থ হবে না। তেমনি জলাতঙ্ক রোগের ওষুধ গ্রামের চিকিৎসা কেন্দ্রে পাওয়া গেলে

মানুষ 'কলা পড়া' খাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে না। অন্তত রোগের প্রাথমিক লক্ষণ সনাক্ত করতে পারলে মানুষ প্রাথমিক ব্যবস্থা নিজেরাই গ্রহণে সক্ষম হবে এবং পরবর্তীকালে উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থার শরণ নিতে পারবে। গ্রামে গ্রামে এখন বিদ্যুৎ যাচ্ছে। অনেকদিন আগে থেকে রেডিওর প্রচলন আছে। বিদ্যুৎ যাবার পর টেলিভিশনের ব্যবহারও বাড়বে। কোনো কোনো গ্রামে ট্রাক্টর দিয়ে চাষাবাদ হচ্ছে। গভীর নলকূপ দিয়ে পানি পাম্প করার ব্যবস্থা এখন প্রায় সর্বত্র। এ সকলের মেরামতের জ্ঞানের অভাবে ওদের বড়ো ক্ষতি হয়ে যায় অথবা এক শ্রেণীর টাউট কারিগর ওদের মারাত্মকভাবে ঠকায়। স্বল্প পুঁজির একজন দর্জির মেশিনটি ৫ দিন অকেজো হয়ে পড়ে থাকলে তাঁর অবস্থা কি দাঁড়াবে ভেবে দেখুন!

সঙ্গতকারণে প্রশ্ন উঠতে পারে দেশে ইয়া বড় বড় বিজ্ঞান সংস্থা থাকতে এই দায়িত্বটা এনজিওদের নিতে অনুরোধ করা কেনো ? বাহুল্য বলা যে, বাংলাদেশে বর্তমানে বিজ্ঞানের বড় বড় নানান প্রকল্পে ইতোমধ্যে কোটি কোটি টাকা নিয়োগ করেছে জানা যায়। তার ফসল এদেশের শতকরা কতো মানুষের প্রয়োজনে আসবে সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। এ সকল প্রকল্পের পরিচালকরা হলেন বিষয় বিশেষজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তা বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপকবৃন্দ। বড় বড় বিজ্ঞান সংস্থা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সম্মেলন করেন। গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। নগর জীবনে অনুসৃত বিজ্ঞান কর্মকাণ্ডের তরঙ্গ গ্রামাঞ্চলে পৌছায় না। গ্রামে বিদ্যুৎ, টেলিভিশন, রেডিও, ট্রাক্টর, পাম্প যাওয়া মানে বিজ্ঞান যাওয়া নয়, প্রযুক্তি যাওয়া। প্রযুক্তি তো বিজ্ঞানের ফলিত রূপ। এই প্রযুক্তির পেছনে যে দর্শন রয়েছে তা অনুধাবন করতে না পারলে মানুষকে যুক্তিনিষ্ট ও বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলা সম্ভব নয়। নগর জীবনে যে বিজ্ঞানচর্চা তা জীবনবিযুক্ত। এখানে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চা নেহায়েৎই অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার। বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত অধিকাংশ বিজ্ঞানকর্মী, বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান-শিক্ষক বিজ্ঞানকে তাঁদের জীবিকা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। এরা সামাজিক সমস্যা নিরসনে কোনো ভূমিকা রাখেন না। এ বিষয়ে কোনো দায়িত্ববোধ করেন না। এঁরা নিজেরাও বিজ্ঞানমনস্ক নন। ঘনিষ্ঠভাবে এঁদের মনমানসিকতা, ধ্যানধারণা ও জীবনাচরণ পদ্ধতির সাথে পরিচয় থাকলে এ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারবেন। কাজেই, সম্ভবত এক্ষেত্রে এনজিওরা সামান্য অর্থ ব্যয় করে গ্রামাঞ্চলে বড়ো ধরনের কাজ করতে পারেন।

পরিবেশের উপর মানুষের প্রভাব

বানর ও অন্যান্য জীবজন্তু পরিবেশের ওপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে না। তেমনি আদি মানবও প্রকৃতিতে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি। ৩,৫০,০০০ বছর আগেও যখন আদি মানব থেকে মানুষের মগজ উন্নত ও বিকশিত ছিলো তখনও মানুষ প্রকৃতির জন্যে কোনো সমস্যা হয়ে ওঠে নি। অস্ট্রালোপিথেকান বা আদি মানবের মগজের আকার ছিলো ৪৫০ কিউবিক সেন্টিমিটার। এ সময় মানুষের মগজের আকার ছিলো ১,১০০ কিউবিক সেন্টিমিটার। এবং এই মানুষেরা তখন আগুনের ব্যবহারও শিখেছিলো। পিকিংয়ের কাছাকাছি অঞ্চলে যে গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানে ওরা বাস করতো এবং আগুন ব্যবহার করতো বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু এরা আগুন দিয়ে বনজঙ্গল ধ্বংস করেছে এমন প্রমাণ আজো ধরা পড়ে নি। মাত্র ১১,০০০ বছর আগে মানুষ আগুন দিয়ে বনজঙ্গল পুড়িয়েছে বলে এক প্রমাণে জানা যায়। প্রকৃতির সাথে সহাবস্থানের বদলে মানুষ যে প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে চেয়েছে তার প্রমাণ হলো কাঠ–কয়লা ও জ্বালানি কাঠের রেণু–যা জীবাণু হিসেবে আবিষ্কৃত হয়েছে।

খ্রিষ্টপূর্ব ১০,০০০ বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যের 'উর্বর ভূমি' এবং এর চতুষ্পার্শ্বের অঞ্চলসমূহে ছোট ছোট ভূখণ্ড পরিষ্কার করে মাটির তৈরি ঘর ও পর্ণ কুটিরের অস্তিত্ব দেখা যায়। নিকানো মেঝের গুচ্ছ গুচ্ছ ঘর পুরো এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। তা উচ্চ তৃণভূমি অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করেছিলো। তারও পরে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠে। এমনকি গ্রীস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত বসতি বিস্তৃত হয়। মানুষ গুহা ছেড়ে স্থায়ী বা অস্থায়ী এ সকল বসতবাটি ব্যবহার করতে শুরু করে। যেখানেই এ ধরনের আবাস নির্মিত হতে থাকে সেখানে প্রকৃতির আদিরূপ পাল্টে যেতে থাকে। মানুষ ধীরে ধীরে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য লাভের প্রক্রিয়া এভাবেই শুরু করে।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা খনন করে আদি গ্রামসমূহে বন্য জীবজন্তুর হাড় ও বন্য উদ্ভিদসৃষ্ট শস্যদানা আবিষ্কার করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, তখনো ওরা সে অঞ্চলের বন্য ভেড়া, ছাগল ও অন্যান্য পশুপাখি শিকার করতো এবং বন্য পরিবেশে সৃষ্ট গম, বার্লি

ইত্যাদি সংগ্রহ করতো। খ্রিষ্টপূর্ব ৮,০০০ সনের দিকে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। হেলেট ক্যাম্বেল ও রবার্ট জে ব্রেইডউড ট্রাইগ্রীসের তুর্কী উচ্চভূমিতে খ্রিষ্টপূর্ব ৭,০০০ বছর আগের একটি গ্রাম খনন করে আদি চাষ সৃষ্ট গম ও গৃহপালিত কুকুর, শূকর, ভেড়া ও সম্ভবত ছাগলের হাড় দেখতে পান। এতে বোঝা যায়, মানুষ তখন প্রকৃতির দয়ার ওপর বেঁচে থাকার ভরসা ত্যাগ করে এসবের চাষ ও পালন শুরু করেছিলো। তখনই মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কে একটা আমূল পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। মানুষ প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ করায়ত্ত করায় এগিয়ে আসে। কৃষি খামার ও শহরাঞ্চল অনাবৃষ্টির কবলে পড়লে ব্যাপক সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। মানুষ এভাবে প্রকৃতির রুক্ষতাকে জয় করে। এটি খ্রিষ্টপূর্ব ৪,০০০ বছর আগের কথা। এ সময় পূর্বেকার গ্রামীণ অঞ্চলে নগরায়ণ শুরু হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০-৩০০০ সনের মধ্যে মেসোপটেমিয়রা তাদের ভূমি ব্যবস্থার আদলে স্থায়ী পরিবর্তন সাধন করে। বনভূমি কৃষিজমিতে পরিণত হয়। সেখানে খালের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা ছিলো। পরবর্তীতে উত্তর আফ্রিকা, পেরু, উত্তর ভারত, চীন ও মেক্সিকোতে যান্ত্রিক চাষেরও প্রচলন ঘটে।

দানিয়ুবের তীরের অঞ্চলসমূহে যেখানে বনজঙ্গল ছিলো ও পানির ভালো ব্যবস্থা ছিলো সেখানে গ্রাম গড়ে ওঠে। প্রথমে হালকা বসতি ছিলো। পরে তা ব্যাপক আবাসিক এলাকায় পরিণত হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৩,০০০ বছরের দিকে নরওয়ে থেকে জিব্রাল্টার এবং বলকান থেকে ইরিল্যাণ্ড পর্যন্ত বসতি গড়ে ওঠে। এতদঞ্চলে আগুন ব্যবহারের স্মারক ও পাথরের কুঠার আবিষ্কার থেকে এই তথ্যের যথার্থ প্রমাণিত হয়।

খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ১,১০০ বছর আগে লোহার লাঙ্গলের অস্তিত্ব দেখা যায়। এ লাঙ্গলের সাহায্যে পুরু ঘাসের চাপড়া (sod) কাটা যেতো। পাথর বা কাঠের লাঙ্গলের পক্ষে যা সম্ভব হতো না। চাষারা লোহার লাঙ্গলের কারণেই যে কোনো অঞ্চলকে চাষের কাজে ব্যবহার করতে পারতো। লোহার লাঙল কৃষিতে বিপ্লব আনে। সারা পৃথিবীতে ব্যাপক হারে চাষ শুরুতে এর ভূমিকা ছিলো অনন্য।

লোহার লাঙল দিয়ে অকর্ষিত মাটি ভাঙা যেতো বটে, তবে এটি খুব গভীরে যেতো না। ফলে মাটির উর্বরাশক্তির ক্ষতি হতো না। নতুন কর্ষণক্ষেত্রসমূহ শত শত বছর ধরে উর্বর থাকতো। তবে বনভূমি কৃষিজমিতে রূপান্তরে যে ক্ষতি তা অবধারিত ছিলো। স্পেনে ভেড়া চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে বিশাল বিশাল বৃক্ষবেষ্টিত ঘন একটি বনাঞ্চল জলাভূমিতে পরিণত হয়। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে একই পদ্ধতি ইটালির দক্ষিণাঞ্চলে প্রবর্তিত হলে সেখানের একটি অঞ্চলের একই পরিণতি ঘটে। বনের আচ্ছাদন বিনষ্ট হবার পর থেকে অদ্যাবধি সেসব অঞ্চল বিরান ও অনুৎপাদী থেকে গেছে।

ক্রমে কাঠের চাহিদা বাড়তে থাকে। বিশেষ করে জাহাজ নির্মাণে কাঠের ব্যাপক চাহিদা দেখা দেয়। দীর্ঘতম গাছগুলো কেটে ফেলার ফলে অরণ্যের ভারসাম্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। জ্বালানি, লোহা গলানোর কারখানা, ঘরদোর বানানো ও শহর গড়ে তোলার জন্যে কাঠের দরকার। উত্তরোত্তর কৃষি জমির প্রয়োজন দেখা দিলে বনাঞ্চল ধ্বংস হতে থাকে। এভাবে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইউরোপের বনভূমি আদি বনভূমির তুলনায় কেবল স্মারক হিসেবেই থাকতে দেখা যায়। অথচ এ সময়টাকে আধুনিক যুগের শুরু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কাঠ যা কিছু রক্ষা পেয়েছিলো দুর্গম অঞ্চলে ও পর্বতে, দেখা গেলো মানুষই ইউরোপের চেহারা পাল্টে দিলো।

একই সময়ে চীন ও এই উপমহাদেশে একইভাবে বনাঞ্চল ধ্বংস হয়। ভারতবর্ষে ঝোপঝাড় ছাগলের জন্যে খাদ্য হিসেবে পর্যাপ্ত বিবেচিত হয় নি। ছাগ–পালকের লম্বা লাঠি থাকতো। লাঠির মাথায় হুকের সাহায্যে বড় বড় গাছের ডালপালা ভেঙে ছাগলকে খাওয়াতো। এভাবে অধিকাংশ গাছকে মেরে ফেলা হয়েছে। ফলে গাছের চারপাশের এলাকা অনুর্বর ভূমিতে পরিণত হয়।

যেখানে বৃষ্টি কম এবং সূর্যের তাপ তীব্র সেখানে বৃক্ষ নিধন ও তৃণভূমি থেকে অধিক তৃণ আহরণের ফলে কেবল বিরান ভূমিরই সৃষ্টি হয় না সে অঞ্চল ক্রমে মরুময়তা কবলিত হয়, যেমনটি স্পেনে ঘটেছে। মানুষ এভাবে সাহারা মরুভূমি সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। এই মরুভূমিই একদিন শিকারী ও পশুপালকের আবাসস্থল ছিলো। এখানেরই নানা গুহায় তাদের শিল্পীরা সেখানে বিচরণকারী পশুদের চিত্র একদিন এঁকে রেখেছিলো। আজ সেখানে জীবনের অস্তিত্ব দেখা যায় কালে–ভদ্রে।

পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের অধিকাংশ বিশ শতকের মধ্যে বহু নগর ও কৃষি জমির অধিকারে চলে গেছে। এখানে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের বাস। পৃথিবীর জনসংখ্যা বর্তমানে ৫৬০ কোটির বেশি। পৃথিবীর প্রায় ৪০ ভাগ জমি এখন তাদের বসতবাটি ও কৃষির অধীন। বনভূমি ও জলাশয় কমে বর্তমানে তিন ভাগের এক ভাগে দাঁড়িয়েছে। এই উপসংহারে না এসে উপায় নেই যে, মানুষের বহুগুণ সংখ্যাবৃদ্ধি মানুষের জীবনধারণের উৎসকে সঙ্কুচিত করে ফেলেছে।

পৃথিবীর ৪০ ভাগ জমি মানুষ ব্যবহার করছে বলাতে এই বোঝায় না যে, আরো ৬০ ভাগ জমি এখনো ব্যবহারের বাকি। এই বাদবাকি ৬০ ভাগ জমি অতি ঠাণ্ডা–অতি শুষ্ক, অতি গরম, অতি পর্বতময়, যা মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য। এগুলোতে কৃষিকাজও সম্ভব নয়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংগঠন (ফাও) সতর্ক অনুসন্ধানের পর জানিয়েছে যে, এই ৬০ ভাগের ক্ষুদ্র অংশে কেবল খাদ্য উৎপাদন করা যাবে।

মানুষ অতি উত্তম জমি ইতোমধ্যে ব্যবহার করে ফেলেছে। অর্থাৎ মোট জমির শতকরা এগারো ভাগ তারা ব্যবহার করেছে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্যে। মাত্র সামান্য অংশ বাকি রয়েছে।

পাঁচ লাখ বছর ধরে, অস্ট্রালোপিথেকানদের কাল থেকে এ পর্যন্ত মানুষের ক্রমবিস্তারণ চলছে। পৃথিবীর বড় অংশে এখন বিস্তারণের আর উপায় নেই। বিশেষ করে উন্নত দেশসমূহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। ফাও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো যে ১৯৮৫ সনের শেষে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বিস্তারণের পর্যায় শেষ হয়ে যাবে।

পৃথিবীকে আর বড় করা যাবে না। মানুষ আর বিস্তার ঘটাতে পারবে না। মানুষকে অতিরিক্ত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। সে প্রশ্ন হলো–এখন যে ভূমি ব্যবহার করছে তা কি সে রক্ষা করতে পারবে ?

প্রকৃতপক্ষে, আমরা যে ভূমি হারাচ্ছি তা খুবই স্পষ্ট। সাহারা মরুভূমি সৃষ্টিতে যে সব অবস্থা সাহায্য করেছিলো, সে সকল অবস্থা–বৈগুণ্যে মরুভূমি দক্ষিণ দিকে বিস্তার লাভ করছে। অনাবৃষ্টি ও বালি–সৃজনের দরুন প্রতি বছর দুই থেকে তিন বর্গমাইল ভূমি হারিয়ে যাচ্ছে। ভারতের থর মরুভূমিরও বিস্তার ঘটছে। এর চতুষ্পার্শ্ব প্রতিবছর আধমাইল মরুময়তার কবলে পড়ছে। ৮০ বছরে প্রায় ৫৬০০০ বর্গমাইল বা উইনকনসিনের সমপরিমাণ ভূখণ্ড বালুময় ভূমিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। ২০০০ বছর আগে এই থর মরুভূমির কেন্দ্রে বনজঙ্গল ছিলো। এই জঙ্গলে বাস করতো ভারতীয় গণ্ডারকুল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ–পশ্চিমের শুষ্ক অঞ্চলসমূহে একটি নতুন অর্ধ–মরু এলাকা প্রায় সৃজনের পথে। শুষ্কতা ছাড়াও, ঘাসের চাপড়া (Sod) ভূমিকে সবসময় রক্ষা করতো–যেহেতু তা চাষাবাদের অযোগ্য হিসেবে পরিগণিত হতো। কিন্তু যখন কোনো সময়ে অপেক্ষাকৃত ভালো বৃষ্টিপাত হতো, খাদ্যশস্যের ভালো দাম পাওয়া যেতো এবং শস্যদানার প্রচুর চাহিদা বাড়তো, তখন হাজার হাজার একর জমি চাষ হতো। তারপর ১৯৩০ সনের দিকে আবার অনাবৃষ্টি দেখা দেয় এবং নতুন কর্ষিত ভূমি বাস্তবিকপক্ষে উড়ে যায়। উড়ানো বালি এমন আচ্ছাদন সৃষ্টি করে যা ভেদ করে সূর্যালোক মাটিতে পৌছাতে পারে না। এই বালি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য–পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে অধিক জলকণা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেওয়া হলে ধূলিধূসরিত এই অঞ্চল জলাভূমিতে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

পৃথিবীব্যাপী, কর্ষণযোগ্য জলপূর্ণ ভূমি ক্রমান্বয়ে কমে আসছে যা খুবই আতঙ্কজনক। জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার দরুণ অনেক জমি উৎপাদন-শক্তি হারাচ্ছে। এই ব্যবস্থা

পরিত্রাণে ব্যাপক, ত্বরিৎ ও বিশুদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে এসব জমি ভবিষ্যতে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের সেচপ্লাবিত অঞ্চলে এই সকল সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং এখানে প্রতি বছর ৬০,০০০ একর জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বিশাল বিশাল বাঁধসমূহ ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এগুলো সেচ প্রকল্পের জন্যে গড়ে তোলা হয়েছিলো। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, এই সকল বাঁধের ফলে কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ার বদলে কমে যাবে। আসোয়ান বাঁধ স্বাভাবিকভাবে পূর্বে স্রোতবাহিত পলি অপসারণে বাধার সৃষ্টি করেছে। এই পলি জমে নীলনদের অববাহিকার সৃষ্টি করেছে। পূর্বে এই পলি জমে বাঁধের পেছনে অনেক স্থানে অববাহিকার সৃষ্টি করেছিলো যার কয়েকটি সমুদ্র ধুয়ে নিয়ে গেছে। এখন নতুন অববাহিকা সৃষ্টি হচ্ছে কম। ফলে সকল অববাহিকা মিলে ভূমির পরিমাণ যা দাঁড়াতো বাঁধের ওপর সৃষ্ট অববাহিকার ভূমির পরিমাণ তার চেয়ে অনেক কম।

মানুষ যেসব ভূমিকে শস্যভূমিতে পরিণত করেছিলো তারও উল্লেখযোগ্য অংশ এখন অন্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশ শতকে নগরাঞ্চলে জনসংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নগরের চারপাশের কৃষি জমি ও মুক্ত জমিতে নগরায়ণ ঘটেছে। এক সময়ের আলু ও ধানের জমিতে গড়ে উঠেছে ঘরবাড়ি, এপার্টমেন্ট হাউজ, বিপণি কেন্দ্র ইত্যাদি।

এভাবে অনাবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, মানুষসৃষ্ট ভূমিক্ষয়, নগরায়ণ ইত্যাদি কারণে মানুষ তার সীমিত পরিমাণ জমির অংশ হারাচ্ছে। কাজেই মানুষের জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় জমি ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

অথচ পৃথিবীতে জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। বাড়তি জনসংখ্যার জন্যে আরো খাদ্য উৎপাদন প্রয়োজন। সঙ্কুচিত কর্ষণযোগ্য জমি ও অনাবাদী উৎপাদনশীল বাদবাকী সামান্য জমিতে আরো বেশি ফসল কিভাবে উৎপাদন করা যায় তার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে মুখ্যত চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। যথা–১. জমিতে সার প্রয়োগ, ২. পোকা–মাকড় ও আগাছা নির্মূলে কীটনাশক ব্যবহার, ৩. যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ, ৪. সেচ–ব্যবস্থা গ্রহণ। সবগুলোরই কিন্তু ভূমির ওপর প্রতিক্রিয়া আছে।

উনিশ শতকে জাস্টাস ভন লিবিগ উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্যে পুষ্টির প্রয়োজন আছে বলে প্রমাণ করেন। মুখ্যত পুষ্টির উপাদানসমূহ হলো নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম। এছাড়াও অন্যান্য আরো কিছু উপাদান স্বল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়। এ সকল পুষ্টি বেশি করে ব্যবহৃত হলে, গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং উচ্চ ফলন হয় বলে জানা গেলো।

গোবর সবসময় সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিলো। কিন্তু বিশ শতকে মানুষ সরাসরি রাসায়নিক সার উৎপাদন শুরু করলো। তৎসত্ত্বেও ১৯৪০–এর আগে আমেরিকায় রাসায়নিক সার ব্যাপকহারে ব্যবহার করা হয় নি, যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অধিক খাদ্যোৎপাদনের চাহিদাকে মদদ যুগিয়েছিলো। সার প্রয়োগে শস্য উৎপাদন দ্বিগুণ, তিনগুণ এমন কি চারগুণ বাড়লো, অর্থাৎ শস্য উৎপাদনে বিস্ময়কর অগ্রগতি হলো। সার–উৎপাদকদের চেষ্টা বৃথা গেলো না। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের চাষীরা সার ব্যবহারে দ্রুত এগিয়ে এলো এবং রাসায়নিক সার ব্যবহারের ধুমধারাক্কা লেগে গেলো। ১৯৬০ সনের দিকে পৃথিবীতে সর্বমোট রাসায়নিক সার ব্যবহার হতো ৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন। কিন্তু উন্নত দেশসমূহে এর মাত্র ১০ ভাগ অর্থাৎ ৩·৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন ব্যবহার করা হতো। ১৯৪৬–১৯৬৮ সনে অর্থাৎ ২২ বছরে নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার ৫৪৩% বৃদ্ধি পায় এবং প্রতি দশ বছরে মুখ্য সারের উৎপাদন দ্বিগুণ, তিনগুণ বাড়তে থাকে। একর প্রতি ফলনও বাড়ে।

ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর জনসাধারণ বুঝতে পারছে যে চমক সৃজক এই বিপ্লবের একটা সর্বনাশা পরিণামও আছে। সার উৎপাদন বাড়াতে পারে বটে, ভূমিধ্বংসেও এর ভূমিকা ভয়াবহ। এখন লাভক্ষতির গুপ্ত হিসাব বের করার সময় এসেছে। জমিতে ব্যবহৃত নাইট্রোজেন পুরোপুরি ব্যয় হয় না। এর কিছু নদী ও সমুদ্রে চলে যায়। নাইট্রোজেন গম ও অন্যান্য উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে যেমন সাহায্য করে তেমনি নদী ও সমুদ্রের বা হ্রদের এলগীকেও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এলগী সংখ্যায় এতো বাড়ে যে এরা পানির প্রায় সবটুকু অক্সিজেন সাবাড় করে দেয়। ফলে জলজ অন্যান্য প্রাণী, বিশেষ করে মাছ অক্সিজেনের অভাবে মারা পড়ে। স্বচ্ছ সরোবর স্যাঁতস্যাঁতে সবুজ রঙ ধারণ করে। হাওর, বিল, পুকুরেও নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ ইত্যাদি মিশছে। কাজেই, বিশুদ্ধ পানি বলতে আজ আর কোথাও তা নেই। নদী–সমুদ্র কলকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য দ্বারা দূষিত হচ্ছে বটে, তবে ব্যাপক দূষণ ঘটাচ্ছে রাসায়নিক সার।

মানুষ বনজঙ্গল, তৃণভূমি সাফ করে কৃষি জমি তৈরি করে তাতে গম, ধান, তুলা বপন করলো। ফলে বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে এসবের ফলন হলো। প্রকৃতিতে এসব শস্যের ফলন ছিলো সীমিত। ওদের ওপর যেসব কীট–পতঙ্গ জীবনধারণ করতো তাদের সংখ্যাও ছিলো সীমিত। এরা বিপুল খাদ্য পেয়ে বহুগুণে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাতে লাগলো। এক পর্যায়ে এ সকল কীট–পতঙ্গ পেস্টে পরিণত হলো। মানুষ বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে শস্যদানার সাথে অন্য দেশ বা মহাদেশ থেকে এ সকল পেস্ট আমদানি

করে। নতুন অঞ্চলে বা মহাদেশে এসে ওরা খাদ্যের প্রচুর সমারোহে নিজেদের বংশবৃদ্ধি করলো ব্যাপকহারে। নতুন পরিবেশে ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু নেই। ফলে স্থানীয় কীট-পতঙ্গ থেকেও ওরা সংখ্যায় বেশিতে পরিণত হলো। এরা ফসলের ক্ষতি করলো অস্বাভাবিকহারে। মানুষের খাদ্য সঙ্কট তীব্র হলো।

এই সমস্যা নিরসনে ত্রাতার ভূমিকায় এলেন পল হেরম্যান মুলার। তিনি ১৯৪৮ সনে ডিডিটি আবিষ্কার করেন। ডিডিটি'র যাদুকরী শক্তিতে কীট-পতঙ্গ মরে সাফ হয়ে গেলো। মশা ও ম্যালেরিয়া রোধে ডিডিটি'র ভূমিকা ছিলো অনন্য। মুলারকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

কিন্তু মুলারের এই সমাধান ছিলো অস্থায়ী এবং এর পরিণাম ছিলো ভয়ানক ক্ষতিকর। এই ক্ষতির পরিমাণ যে এতো বিশাল হবে তা তখন ভাবা হয় নি। ডিডিটি ছাড়াও অসংখ্য কীটনাশক আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হয়েছে। সবগুলোর ভূমিকা অনেকটা একই রকম। ডিডিটি ও অন্যান্য কীটনাশক মাটি ও বায়ুকে দূষিত করছে। বৃষ্টির পানি এইসব বিষকে ধুয়ে নিয়ে ফেলছে পুকুর, খাল-বিল, নদী ও সমুদ্রে। এই বিষের প্রভাবে সমস্ত জীবকুল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এক প্রাণী অন্য প্রাণী খেয়ে বাঁচে। খাদ্য-শৃংখল বা ফুড-চেইনের সবশেষে আছে মানুষ। কাজেই মানুষের দেহও এই বিষের প্রভাবের আওতায়। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন এভাবে কীটনাশক জমতে থাকলে জীবকুলের যে সার্বিক ক্ষতি হবে তা পূরণ করা সম্ভব হবে না।

কীট-শত্রু দমনের জন্যে ডিডিটি ও অন্যান্য কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে বটে ; কিন্তু প্রকৃত প্রমাণে দেখা যাচ্ছে এতে শত্রুর সংখ্যা বাড়ছে বই কমছে না। এতে ফুড-চেইনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। এবং নির্দিষ্ট এলাকায় সমগ্র জীবকুলকে বিপর্যস্ত অবস্থার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। একটা উদাহরণ বিষয়টি স্পষ্ট করায় সহায়ক হতে পারে। পেরুর কোনো কোনো এলাকায় ১৯৪৯ সনে ডিডিটি ও অন্যান্য কীটনাশক তুলাচাষে ব্যবহার করা হয়। প্রতি একরে ফলন ৪৪০ পাউণ্ড থেকে বেড়ে ৬৪৮ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। তুলার শত্রু এফিড দমন হবার কারণে এই বাড়তি ফলন সম্ভব হয় বলে ধারণা। তিন বছর পর ডিডিটি এফিডের বিরুদ্ধে কার্যকারিতা হারায়। এফিড তার শরীরে ডিডিটি রোধী ক্ষমতা অর্জন করে। এর মধ্যে এফিডের প্রাকৃতিক শত্রুও এফিডের সাথে সাথে মারা গিয়ে থাকবে। ফলে নতুন ক্ষমতাসম্পন্ন এফিড দ্রুত বাড়তে থাকে। এর কয়েক বছর পর এখানে আরো পাঁচ ছয়টি পোকার উপদ্রব বাড়ে। এরা আগে আশেপাশের এলাকা থেকে যেখানে ডিডিটি বা কীটনাশক ছড়ানো হয় নি, সেখানে ওদের সংখ্যা কম ছিলো, কারণ ওদের প্রাকৃতিক শত্রু ছিলো। এই

তুলাক্ষেত ছিলো শত্রুহীন। দেখা গেলো পাঁচ বছর পর অর্থাৎ ১৯৫৪ সনে তুলার ফলন কমে ৪৪০ পাউণ্ডের এক তৃতীয়াংশে দাঁড়ালো। কীটনাশক ব্যবহারের সুদূরপ্রসারী ফল—ফলন কমলো, শত্রু বাড়লো। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশও দূষিত হলো। যার পরোক্ষ ফলের দরুণ সমস্ত জীবকুলকে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে ও হবে।

সম্প্রতি অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। উচ্চ ফলনশীল বীজ আবিষ্কৃত হচ্ছে আণবিক গবেষণার মাধ্যমে। কৃত্রিম প্রজনন ও অন্যান্য উপায়ে অধিক মাছ, মাংস, দুধ উৎপাদনের প্রয়াস চলছে। পূর্বে যে ধানের ফলন হতো ১৫০–১৮০ দিনে তা আজ ১২০ দিনের মধ্যে সম্ভব হচ্ছে। যে গাভী বছরে ৬০০ পাউণ্ড দুধ দিতো, তা বছরে ৯০০ পাউণ্ড দুধ দিতে পারে। সবুজ বিপ্লবের শ্লোগান চলছে তামাম দুনিয়ায়। উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশে এর জন্যে তোড়জোর চলছে সমান তালে।

এই বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্যে প্রয়োজন অধিক শক্তি ব্যয়ের। সার তৈরিতে অধিকতর শক্তি ব্যয় করতে হচ্ছে। কৃষির যান্ত্রিকীকরণে প্রচুর শক্তি অর্থাৎ জ্বালানি ব্যয় হচ্ছে। অর্থাৎ অধিক উৎপাদন মানে অধিক শক্তি ব্যয়। কিন্তু শক্তির ভাণ্ডার তো অফুরন্ত নয়। সীমিত ভাণ্ডার নিঃশেষ হলে তখন মানবজাতির ভবিষ্যৎ কি? প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদিত হলে বাড়তি শক্তি খরচের প্রয়োজন পড়তো না। সেক্ষেত্রে সৌরশক্তিই পর্যাপ্ত ছিলো।

তুলা ও কৃত্রিম তন্তুর কথা ধরা যাক। তুলা ও নাইলন লম্বা আঁশ দিয়ে তৈরি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশ জোড়া লেগে দীর্ঘ আঁশ সৃষ্টি হয়। এটা হতে শক্তির দরকার। তুলা গাছ শক্তি পেতো সূর্য থেকে এবং তার জন্যে নিম্ন তাপমাত্রা হলেও চলে। এই শক্তি পেতে অর্থের প্রয়োজন হয় না। এই প্রক্রিয়ায় দূষণের কোনো সম্ভাবনা নেই। নাইলন তৈরির জন্যে কৃত্রিম শক্তি ব্যয় করতে হয় এবং নাইলনের আঁশ জোড়া লাগানোর জন্যে উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন যা বায়ু দূষণে সাহায্য করে। কৃত্রিম উপায়ে তৈরি অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

কৃত্রিম দ্রব্য অন্যান্য সমস্যাও সৃষ্টি করে। প্লাস্টিক দীর্ঘদিন ধরে পচে না, গলে না। এটা পানিতে ভেসে থাকে। শহরাঞ্চলে পয়ঃপ্রণালী বন্ধে এদেরকে সমস্যা হিসেবে দেখা যাচ্ছে। এক হিসেবে দেখা গেছে, সারগাসো সমুদ্রের ১ বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৩৫০০ খণ্ড প্লাস্টিক ভেসে বেড়াচ্ছে।

মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্যে নতুন নতুন উপায় ও প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং এতে নতুন নতুন সমস্যারও সৃষ্টি হচ্ছে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত

হচ্ছে পরিবেশ। পরিবেশের ক্ষতি মানে মানুষসহ জীবকুলের ক্ষতি। কাজেই মানুষের সাফল্য খুব একটা আশাব্যঞ্জক বলা যায় না। সার্বিক বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে–

—পৃথিবীতে ভূমির পরিমাণ স্থির এবং তা প্রসারণযোগ্য নয়।

—কর্ষণযোগ্য জমির প্রায় সবটুকুরই ব্যবহার ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

—সামান্য উৎপাদনক্ষম জমি এখন অবশিষ্ট রয়েছে।

—শস্যের ফলন বাড়ানোর জন্যে বর্তমানে যেভাবে সার ব্যবহৃত হচ্ছে তা জলজ জীবকুলের জন্যে হুমকি সৃষ্টি করছে এবং পানিতে বিদূষণ ঘটাচ্ছে।

—কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ শেষাবধি কীট-শত্রু দমন তো করতে পারছেই না; বরং প্রতিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করছে। মানুষ এই প্রতিবেশ শৃংখলের একটি অংশ।

—'সবুজ বিপ্লব' সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অধিক ফলনের জন্যে অধিক কৃত্রিম শক্তি ব্যয় হচ্ছে।

—প্রাকৃতিক উৎপাদনের তুলনায় কৃত্রিম উৎপাদনে অর্থব্যয় বেশি। কৃত্রিম উৎপাদন ভূমি ও বায়ু দূষণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে।

অনুমান করা হচ্ছে যে, ৩০০০ রাসায়নিক দ্রব্য বাতাসে মিশছে এবং প্রায় ৫,০০,০০০ দূষণকারী দ্রব্য সমুদ্রে পড়ছে। পৃথিবীর শহরগুলোর পর্বতপ্রমাণ আবর্জনা ফেলা হচ্ছে নদী-সমুদ্রে। নিউইয়র্ক পোতাশ্রয় ও তার আশেপাশের মহীসোপানের তলদেশে প্রায় ২১০ বর্গ কিলোমিটার ভরে আছে এসব জঞ্জালে।

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, জ্বালানি উদ্ভুত কার্বন ডাই-অক্সাইড পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ। প্রতি বছর বাতাসে ০.২% কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে। এর অর্ধেক বায়ুমণ্ডলে থেকে যাচ্ছে। অপর অর্ধেক জৈবমণ্ডল ও সমুদ্র গ্রহণ করছে। এটি পরিমাণে আরো বেড়ে গেলে অধিক সৌর বিকিরণ শোষণ করতে পারে এবং মেরু অঞ্চলের বরফ গলাতে পারে। ফলে মহাপ্লাবন দেখা দিতে পারে। অগ্নুৎপাত, মরুভূমি ও শুষ্কভূমি এবং চাষবাস উদ্ভুত সূক্ষ্ম বালিকণা, কলকারখানার চিমনী নির্গত ধোঁয়া, জ্বালানি পোড়া ধোঁয়া প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলে মিশছে। এদের বর্ণ অনুযায়ী এরা সৌর বিকিরণের প্রতিফলন বা শোষণ ঘটিয়ে পৃথিবীর তাপমাত্রায় ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করতে পারে। সুপারসনিক জেট বিমান ও অন্যান্য বায়ুপোত নির্গত জলীয় বাষ্প ও কণা ওজোন স্তরের ক্ষতি করতে পারে। পৃথিবীকে ওজোন স্তর আচ্ছাদন দিয়ে রেখেছে। নতুবা সৌর বিকিরণ সরাসরি পৃথিবীতে এসে পড়তো। প্রধান বিপদ হলো

জেট বিমানের হাইড্রোকার্বন সূর্যরশ্মির সাথে বিক্রিয়া করে কুয়াশার সৃষ্টি করে যা দূর থেকে মেঘের মতো দেখায়। এই কুয়াশা বা মেঘ পৃথিবীতে সূর্যালোক আসায় বাধা দেয়।

নদী ও সমুদ্রের জন্যে আরেক বিপদ হলো জলযান। মানুষ প্রায় সকল পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করছে জাহাজ স্টিমারের সাহায্যে। জ্বালানি পুড়ে বর্জ্য পদার্থ তো পানিতে মিশছেই, সবচেয়ে বড় বিপদ হলো তৈলবাহী জাহাজ প্রচুর তেল সমুদ্রে মিশাচ্ছে। বছরে কয়েকটি তৈলবাহী জাহাজ সমুদ্রে ডুবেও যাচ্ছে। জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেই, ডাঙার যেসব প্রাণী সমুদ্রনির্ভর তারাও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষ সংখ্যায় প্রচুর বেড়েছে এবং তারা ব্যাপক ক্ষমতা অর্জন করেছে। তারা আবহাওয়ার সংগঠনকে বদলে দিতে পারে, পৃথিবীর চেহারা পরিবর্তন করে দিতে পারে। প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে যা পরিবর্তন করতে পারতো এ পরিবর্তন তারচেয়ে বেশি। কিন্তু মানুষের মনে রাখা প্রায়োজন পৃথিবীর বড় অংশে গড় তাপমাত্রার সামান্য পরিবর্তনে বড় বড় দেশের সমান বরফ খণ্ড এগিয়ে আসতে পারে, সরে যেতে পারে, গলে যেতে পারে, তাতে মহাপ্রলয় সৃষ্টি হতে পারে, হতে পারে মহাপ্লাবন, সর্বগ্রাসী অনাবৃষ্টির কবলে পড়তে পারে, সমুদ্র স্তরের উর্ধ্বগতি ঘটতে পারে। কাজেই মানুষ যদি এখন থেকে সতর্ক না হয়, তাহলে চরমতম মূল্য দিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারবে না।

মহাপ্লাবনের প্রতীক্ষায়

দৈনিক খবরের কাগজ, সাময়িকপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, সেমিনার ও প্রদর্শনীতে সমুদ্রের তলদেশ–স্ফীতি, গ্রীন হাউজ এফেক্ট, পৃথিবীর তাপমাত্রার উর্ধ্বগতি ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে। কেবল বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ১২–১৫ শতাংশ ভূখণ্ড অচিরেই সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। পুরাকালেও নানান পুঁথি ও লোকগাঁথায় মহাপ্লাবনের ভয়াবহ বিধ্বংসী চিত্র আঁকা হয়েছে। বলা আছে পৃথিবীতে অনেকবার মহাপ্লাবন এসেছে এবং পৃথিবীর জীবসম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রচণ্ডতম ক্ষতি সাধিত হয়েছে। হিন্দু পুরাণে আছে, মহাপ্লাবনের ঢেউ সমুদ্রোপকূলে ছোবল হেনে অসংখ্য জীবন কেড়ে নিয়েছে। গ্রীক পুরাণ বলে, মহাপ্লাবনের জন্যে দায়ী হলেন দেবতা জিউস। অলিম্পিয়ান দেবতাদের মধ্যে জিউস হলেন প্রধান। এছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য সংস্কৃতিতেও এই প্লাবনের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এসব কি কেবল কথার কথা ? এর মধ্যে কি সত্যতা কিছু নেই ? ভাবার নেই ? এ সকল অবশ্যই মনগড়া কাহিনী নয়। নয় আষাঢ়ে গল্প। এসবের বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। এই তো সেদিন চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও বরিশালে ঘূর্ণিঝড় ও সমুদ্রোচ্ছ্বাসের তাণ্ডব সংঘটিত হয়ে গেলো। ১৯৬০, '৬২, '৬৯ সালের বিধ্বংসী ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, '৮৮-র প্লাবনের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রায়ই এ ধরনের প্লাবন, জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হচ্ছে। কোনোটি বড়, কোনোটি ছোট। প্রমাণিত যে ৬,০০০ বছরের মধ্যে সমুদ্রতল স্ফীত হয়েছে এবং পৃথিবীর অনেক ভূখণ্ড তলিয়ে গেছে জলের নিচে। স্বাভাবিকভাবেই ভূখণ্ডের জেগে ওঠা ও তলিয়ে যাবার ঘটনা ঘটতে পারে। ঘটতে পারে আবহাওয়ার কারণে, সামুদ্রিক কারণে এবং দীর্ঘস্থায়ী মহাজাগতিক জোয়ার–ভাটার কারণে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে।

সদ্য অতিক্রান্ত বিশ লাখ বছর সময়কালকে কোয়ার্টারনারি পিরিয়ড বলা হয়। এই সময়কালকে আবহাওয়া বিবিধায়নের বিরামকাল বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

সমুদ্রের হিমবাহজনিত তলানি, মাটির ধরন ও তলানি পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, এই কোয়ার্টারনারি সময়ে পৃথিবী কয়েকবার বরফাচ্ছাদিত হয়েছিলো। ১৫,০০০ বছর আগে ব্যাপক ধরনের বরফযুগের অস্তিত্ব জানা যায়। বরফযুগ আবহাওয়া বিষয়ে নানা ধরনের ধারণার সৃষ্টি করেছে। এখন সবাই নিকট ভবিষ্যতে আরেকটি বরফযুগের আশংকা করছেন, যেহেতু আবহাওয়ায় ক্রমেই কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে। বরফযুগ উদ্ভবের কারণ যাই থাকুক সমুদ্র স্তরের পরিবর্তন একটি কারণ অবশ্যই। সমুদ্রের নানা বৈশিষ্ট্যের জন্যে কোয়ার্টারনারি সময়কালের বরফযুগ দায়ী।

বরফ সমুদ্রতলকে ১০০ মিটার বা এরও বেশি নামিয়ে এনেছিলো এবং ভূভাগের তাপমাত্রায় কয়েক ডিগ্রি হেরফের করেছিলো। সমুদ্রস্তরে পীঠ ও প্রাণীর দেহখোলক পরীক্ষা করে সর্বশেষ বরফযুগের কাল নির্ণয় করা হয়েছে। এ সকল তলানি এখনো পানির তলায় জমা রয়েছে। তলানি স্তরের গভীরতা ও কাল থেকে কাল্পনিক রেখা দিয়ে আঁকচিত্র করলে বর্তমানের সমুদ্র-ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের স্বরূপ ধরা পড়বে। এতে দেখা যায় ১৫,০০০ বছর আগে সমুদ্রতল আরো প্রায় ১০০ মিটারের অধিক নিচে ছিল। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বর্তমানে নিমজ্জিত মহাদেশীয় সোপান একদা সমুদ্রস্রোত ও ঢেউ দ্বারা বিধৌত হতো। সমুদ্র আরো গভীরে নিক্ষেপ করতো। ৭,০০০ বছর ধরে দ্রুত সমুদ্র স্তরের উত্থান ঘটে। প্রায় ৯০ মিটার উত্থান হয়। পরের ৭,০০০ বছরে ধীরে ও অনিয়মিতভাবে বাকি ১০ মিটার উত্থান সম্পন্ন হয়। সমুদ্র তলদেশ নিচু থাকাকালে এশিয়া ও উত্তর আমেরিকা 'ভূমি-সেতু' দ্বারা সংযুক্ত ছিল। অগভীর প্রণালী ও খণ্ড সমুদ্রের নিচে এই ভূমি-সেতু হারিয়ে গেছে। প্লিস্টোসিনকালে সমুদ্রতল নিচু থাকার সময় প্রাণীকুল এশিয়া থেকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় পরিযান করতো।

বরফ সমুদ্রের পরিবেশেও পরিবর্তন এনেছিলো। যেমন, সমুদ্রপৃষ্ঠের বিশাল জলরাশিও এ সময় বরফে পরিণত হয়। গভীর সমুদ্রে ভূরসায়নবিদ্যা ও অণুপ্রত্নবিদ্যার সাহায্যে এ সকল পরিবর্তন সনাক্ত করা গেছে। পানি ও জীবিত প্রাণিদেহে এবং অতীতের প্রাণিদেহে আইসোটোপের পরিমাণ নির্ধারণকারী হলো পানির তাপমাত্রা। আইসোটোপ নিয়ে গবেষণা করলে সমুদ্রতাত্ত্বিক পরিবর্তনসমূহ প্রকাশ পাবে। তাপমাত্রার পরিবর্তনের দরুন ফোরামিনিফেরা নামের সমুদ্র-অণুজীবের খোলকের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন সাধিত হয়। গভীর সমুদ্র স্তরে প্রাপ্ত এ সকল প্রাণীর খোলক গবেষণা করলে অতীত সমুদ্রের জলরাশির তাপমাত্রা সম্পর্কে জানা যাবে।

এ সকল সুপ্রমাণিত পরিবর্তন, বর্তমানের ভূতাত্ত্বিকভাবে সমুদ্রতাত্ত্বিক প্রতিবেশসমূহ, অতীতের প্রতিনিধিত্ব যে করছে না তার সাক্ষ্য দেয়। সমুদ্রের রাসায়নিক, জীববিজ্ঞানিক ও ভৌতবিজ্ঞানিক ধর্ম সমুদ্রের ওপর হিমবাহিক প্রভাব নাটকীয় ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনজাত প্রভাবের চেয়ে মন্থর গতির।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পৃথিবী আন্তঃ তুষারকালের সম্পূর্ণ আওতাবহির্ভূত কি না। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের প্রবাহ ও সমুদ্র তলদেশ পরীক্ষা করে জানা গেছে যে সমুদ্রের তলদেশ এখনো ধীরে উত্থিত হচ্ছে। এটি ভূমি-চ্যুতি ও সমুদ্র তলদেশ বিস্তারণ, আবহাওয়া পরিবর্তন হেতু বরফ গলে যাওয়া বা সাগর উত্তপ্ত হওয়া বা অন্য কোনো কারণে হতে পারে। তবে তলদেশ উত্থানের রহস্য এখনো স্পষ্ট নয়। পৃথিবীর বর্তমান মজুদ বরফ গলে গেলে তলদেশ আরো ৬০ মিটার উঁচু হবে। এতে ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দেবে কারণ পৃথিবীর জনসংখ্যার অধিকাংশ সমুদ্রোপকূলে বা এর কাছাকাছি বাস করে। বিপরীতে, পৃথিবী আরেকটি বরফযুগে প্রবেশ করলে পৃথিবীর তাপমাত্রা সাধারণভাবে হ্রাস পাবে এবং সমুদ্র তলদেশ নিচে নেমে যাবে এই সম্ভাবনাই বেশি ভাবিয়ে তুলছে, কারণ পৃথিবীতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এবং অন্যান্য গ্রীন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবী ও তার আবহাওয়া সৌর বিকিরণ শোষণ করে এবং তা চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশে এর নিজস্ব বিকিরণ হিসেবে ছড়িয়ে দেয়। দীর্ঘদিন ধরে এই শোষণ ও বিতরণ প্রক্রিয়া চলে। তবে শোষণ ও বিতরণের হার প্রায় সমানুপাতিক থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে, পৃথিবী ও এর আবহাওয়ায় বিকিরণ গ্রহণ-বিতরণ পদ্ধতি সূর্যের বিকিরণ-বিতরণের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে। এই ভারসাম্য রক্ষায় এবং আবহাওয়ামণ্ডলে তাপমাত্রা নির্ধারণে পৃথিবী ও আবহ পদ্ধতিতে অনেকগুলো প্রক্রিয়া কাজ করে। প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলো আবহাওয়া গঠনকারী অণুসমূহের বিকিরণ, শোষণ ও বিতরণ।

বর্তমানে বাতাসের শতকরা ৭৬ ভাগ হলো নাইট্রোজেন ও শতকরা ২৩ ভাগ অক্সিজেন। বাদবাকি হলো আর্গন, জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি। আবহাওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ পৃথিবী থেকে অবলোহিত রশ্মি বিকিরণের সময় একে জলীয় বাষ্পের মতো অস্বচ্ছ দেখায় ; আবার সৌর রশ্মি বিকিরণের সময় দেখায় স্বচ্ছ। ফলে সৌর রশ্মি বিকিরণ পৃথিবীতে সরাসরি এসে পড়ে এবং পৃথিবীর অবলোহিত রশ্মি বিকিরণে বাধা পড়ে। এতে করে পৃথিবীতে 'গ্রীন হাউজ এফেক্ট' দেখা দেয় এবং ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। আবহাওয়ামণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়লে অধিক তাপ শোষিত হয়।

সবাই স্বীকার করেন যে, গত তিন দশক ধরে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেছে। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির এটি একটি কারণ। কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধিতে বিস্ময়ের কিছু নেই। প্রতি বছর তেল বা জ্বালানি পুড়ে প্রায় ১৮ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হয় এবং বাতাসে মেশে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির অন্য কারণ হলো অরণ্য-ধ্বংস ও বৃক্ষ-নিধন। মানুষ বসতি বিস্তারের জন্যে অরণ্য বিলোপ করছে এবং জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করছে।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি এই গ্রহের জন্যে শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছে। জ্বালানি পোড়ানো বন্ধ না হলে এ সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই বলেই অনুমিত হয়। সমস্যা আরো জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ পৃথিবীর কোন্ পরিবর্তনটা কার্বন ডাই-অক্সাইডের জন্যে এবং কোনটা অজ্ঞাত কারণে তা নির্ণয় করা দুষ্কর।

অন্যদিকে কিছু বিজ্ঞানীর অভিমত হলো, বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি ও গ্রীন হাউজ এফেক্ট ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে যা পৃথিবীর জন্যে কল্যাণকর হবে। তাদের ধারণা, অপেক্ষাকৃত বাড়তি তাপ অধিকতর জলকণা বহন করবে এবং এন্টার্কটিকার মতো অঞ্চলসমূহে অধিক তুষারপাত ঘটাবে। তুষারখণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং সমুদ্র-তলদেশের গভীরতা বাড়বে। কিছু বিজ্ঞানীর ধারণা, বর্ধিত কার্বন ডাই-অক্সাইড, আবহাওয়ামণ্ডলের অন্যান্য গ্যাসের সাথে মিশে যাবে এবং স্বল্পমাত্রার গ্রীন হাউজ এফেক্ট ঘটাবে অথবা আদৌ গ্রীন হাউজ এফেক্ট ঘটাবে না। তাঁরা আরো লক্ষ্য করেন যে, বর্ধিত কার্বন ডাই-অক্সাইড ফলন বাড়ায় এবং উদ্ভিদের প্রস্বেদন হার কমায়। এক লিটার জলে যে পরিমাণ উৎপাদন হতো তার পরিমাণ এক্ষেত্রে দ্বিগুণ হয়। যদি এটি সত্যি হয় তাহলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধিতে ভয়ের কিছু নেই। অন্যদৃষ্টিতে, যদি সমুদ্রতল স্ফীতি ও গ্রীন হাউজ এফেক্টের জন্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডই কেবল দায়ী হয় তাহলে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন বা সিএফসি, নাইট্রাস অক্সাইড ও মিথেনও এর জন্য দায়ী। সিএফসি প্লাস্টিক ফোম তৈরি এবং রেফ্রিজারেটর ও শীততাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের শীতলক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। শতকরা ১৫ ভাগ গ্রীন হাউজ এফেক্টের জন্যে এই শীতলক দায়ী। যানবাহনের পোড়া জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা থেকে নাইট্রাস অক্সাইড নির্গত হয়। ভূগর্ভস্থ তেল থেকে মিথেন গ্যাসের উৎপত্তি। গরু-বাছুরের পাকস্থলীস্থিত ব্যাকটেরিয়া, ডোবাবদ্ধ পানিতে গাছগাছড়া পচে ও সমুদ্রোপকূলের জলাভূমিতেও মিথেন উৎপন্ন হয়। কাজেই, নানা উৎস থেকে গ্রীন

হাউজ গ্যাসসমূহ উৎপাদিত হয়ে আবহাওয়ায় মিশছে। এটি বন্ধ হবার জো নেই। তবে এসবের উৎপাদন ও আবহাওয়ায় মিশ্রণের পরিমাণ হয়তো কমানোর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

গ্রীন হাউজ গ্যাসসমূহের ঘনত্ব এবং আবহাওয়ার তাপমাত্রা কীভাবে ভবিষ্যৎকে পরিবর্তন করবে তার পূর্বঘোষণা দেয়া মুশকিল। ভবিষ্যতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং-এর প্রতিক্রিয়া বিষয়ে কয়েকটি বড় ধরনের গবেষণার ফলাফল পাওয়া গেছে। এক গবেষণায় দেখা যায় পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি যদি ঘটতে থাকে তাহলে তা অবশ্যই বিপজ্জনক হবে।

যা হোক, এটা প্রমাণিত যে গ্রীন হাউজ গ্যাসসমূহের পরিমাণ আবহাওয়ায় বাড়ছে, পৃথিবীর তাপমাত্রা ও সমুদ্রতলের উর্ধ্বগতি ঘটছে এবং বৃদ্ধির হার অদূর ভবিষ্যতে আরো বাড়বে। এ সকল প্রমাণ আমাদের মনে হতাশা সৃষ্টি করলেও এটা সত্যি যে, এসবের আমরা কতটুকুই বা জানতে পেরেছি।

ভূবিজ্ঞানীরা ১৯৯০ সনে প্রকৃতপক্ষে দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটিয়েছেন। যদি এভাবে গ্রীন হাউজ এফেক্ট ঘটতে দেয়া যায় তাহলে ৮০ বছরের মধ্যে কী হতে পারে ভেবে তাঁরা শংকিতবোধ করেছেন। কারো বিশ্বাস একবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যে জীবকুলের অবলুপ্তি ঘটতে পারে। গত ৯০ সনে পৃথিবীর তাপ ছিলো সর্বোচ্চ। অর্থাৎ গড়ে ২৫° সেঃ। পরিবেশ সম্বন্ধে যদি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতো তাহলে ঘটনা অন্যরকম ঘটতে পারতো। সে ক্ষেত্রে কলকারখানা সৃষ্ট বিদূষণের ব্যাপারে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। দেখা যাচ্ছে, একবিংশ শতাব্দী নাগাদ পৃথিবীর তাপমাত্রা ৫.৫০ সেঃ বাড়তে পারে। এ সময় বর্তমান বৃদ্ধির হার বিবেচনায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ হতে পারে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, বাষ্পীভবন ও জলীয় বাষ্পের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে। অন্য গবেষণায় দেখা যায়, তাপমাত্রা বাড়বে বটে তবে তাতে আরো কয়েক দশক সময় অতিবাহিত হবে যদি সমুদ্রের জল কিছু তাপ শোষণ করে নেয়।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে দুটো ব্যাপার অবশ্যই ঘটবে। তা হলো, সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরি-স্তরসমূহের সম্প্রসারণ এবং অধিকাংশ বরফের বিগলন। বরফ বিগলনের ফলে সমুদ্রতলের স্ফীতি ঘটবে এবং নিচু এলাকা পানিতে ডুবে যাবে। এ ধরনের জলস্ফীতি কৃষি জমির ক্ষতি করবে এবং বৃষ্টিপাতকে প্রভাবিত করবে। গত শতকে সমুদ্রতলের ১০-১৫ সেন্টিমিটার স্ফীতি ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ৫ সেন্টিমিটার সমুদ্রতল স্ফীতি পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে এবং বাদবাকি ৫-১০ সেন্টিমিটার

স্ফীতি বরফ বিগলনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় বলে ধারণা। কারণ পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির অনুপাতে বরফ বিগলনের হার সম্বন্ধে জানা গেছে খুবই কম। এসব অনুমান থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে একবিংশ শতাব্দীতে নিচের সারণী অনুযায়ী সমুদ্রতল স্ফীতি ঘটতে পারে।

সারণী ২০০০–২১০০ সালে অনুমিত সমুদ্রতল স্ফীতি (সে.মি.)

বছর	সর্বনিম্ন	মধ্যম	উচ্চ	ঐতিহাসিক মেরু বিযুক্তি বা বরফ বিগলন
২০০০	৪.৮	৮.৮	১৭.১	২–৩
২০২৫	১৩.০	২৬.২	৫৪.৯	৪.৫–৮.২৫
২০৫০	২৩.৮	৫২.৩	১১৬.৭	৭–১২
২০৭৫	৩৮.০	৯১.২	২১৭.৭	৯.৫–১৫.৫
২১০০	৫৬.২	১৪৪.৪	২৪৫.০	১২–১৮

দূষণের ব্যাপারে যদি আন্তর্জাতিক চুক্তি না হয় এবং গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গত করার সীমা বেঁধে দেয়া না হয় তাহলে বিপদ হতে পারে। বর্তমান কলকারখানা, কৃষি, শক্তি উৎপাদন ও পরিবহণ সৃষ্ট দূষণ সম্পর্কে সমঝোতা না হলে গ্রীন হাউজ এফেক্ট ভয়াবহ হতে পারে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়বে, বরফ গলবে, সমুদ্রতলের উর্ধ্বগতি ঘটবে এবং ভূভাগ পানির তলায় নিমজ্জিত হবে। এভাবে পৃথিবী ক্রমে মহাপ্লাবনের মুখোমুখি হবে বলে ধারণা।

লোকঐতিহ্যে অরণ্য

অতি প্রাচীনকাল থেকে অরণ্য মানবসভ্যতার কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের অংশী হয়ে আছে। মহাকবি কালিদাসের মহান সৃষ্টি "অভিজ্ঞান–শকুন্তলম্" মহাকাব্যে অরণ্যের নৈসর্গিক সৌন্দর্য সম্পর্কে অপরূপ চিত্র এঁকে গেছেন। কবি নায়িকা শকুন্তলার বাসগৃহের বর্ণনা করছেন এভাবে ঃ

> শকুন্তলার কুঠিরের চারপাশ ঘিরে স্বচ্ছ সরোবরে প্রস্ফুটিত শত শত কুমুদ–কুমুদী। ভগবান অংশুমালীর তীব্র দাহন থেকে কুঠির রক্ষায় ব্যস্ত প্রলম্বিত অগণিত তরুশাখা। ওরা কুঠিরকে আচ্ছাদিত করে একে তপোবনের মহিমা দান করেছে। মলয় হিল্লোল বহু বর্ণা পুষ্প বিতানকে দোদুল দোল দিয়ে চলেছে অবিরাম। পুষ্পরাজির গন্ধগীতে চতুর্দিক মাতোয়ারা। পাতায় পাতায় জমে থাকা শিশির তরুমূলে জলসিঞ্চন করছে পরম নিষ্ঠায়। স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত এই নিসর্গে নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে আপনার মনে আপনি ভ্রমিছে নানা বর্ণের শিখী ও মৃগদল।

বনের এই শান্ত শোভা যুগ যুগ ধরে ঈশ্বরে সমর্পিত ও লোক হিতে নিবেদিত সাধু সন্যাসীদেরকে আকর্ষণ করেছে। সাধক তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সৌম্য জীবনের সাথে বনানীর সমাহিত আচরণের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। ধীরবহা বায়ু অরণ্যে সব দিক থেকে বয়ে আনে অনন্য সুগন্ধ। অরণ্য হলো প্রকৃতির বিশুদ্ধতম রূপ। অরণ্যের হংসের ডানা কল্লোল সরোবর, সরোবরের স্ফটিক স্বচ্ছ জল, তরলিত চন্দ্রিকা চন্দনবর্ণা ঝর্ণা, গজেন্দ্রগামিনী স্রোতস্বিনী ও বেগবতী নদী, অনন্ত বিস্তৃত শ্যামলী নিসর্গ, শ্যামলিমার বুকে জেগে উঠা নানা বর্ণের ফুলের সমারোহ, ফুলে ফুলে মাতোয়ারা বিচিত্র বর্ণের ভ্রমর ও পাখি, পাখির বৈকালিক কলতান, জীবজন্তুর নানা শব্দ–অভিব্যক্তি এবং অরণ্যের অসাধারণ নৈঃশব্দ ও নিঃসঙ্গতা সাধক হৃদয়কে পুলকিত করে। স্নিগ্ধ, শান্ত এই পরিবেশ তাঁকে এখানে জীবন নির্বাহে স্বস্তি দেয়। আশ্বস্ত করে। সাধকের চোখে জাগতিক চাকচিক্য মলিন হয়ে যায়।

সাধকেরা বাস করতো গুহায় বা পর্ণ–কুঠিরে। তাঁদের আহার্য ছিলো ফল–মূল, কাণ্ড ও পাতা। পরিধেয় ছিলো জীবজন্তুর চামড়া, গাছের বাকল। সাধকরা নয় কেবল, আদিযুগে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা অরণ্যেই বসবাস করতো। অরণ্যচারী এই মানুষেরা প্রকৃতির সাথে নিবিড়ভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলো। ফলে তারা প্রকৃতির নানা রহস্য উন্মোচনে সক্ষম হয়েছিলো। তাদের সাথে সখ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিলো বৃক্ষ ও পশুপাখির সাথে। তারা ক্রমে বৃক্ষের, লতাগুল্মের জীবন পরিক্রমার সাথে পরিচিত হয়েছিলো। পশুপাখির আচার–আচরণ বুঝতে শিখেছিলো। ভেষজ বিষয়ে তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলো পর্যাপ্ত। সে সকল অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তী প্রজন্ম উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যাসহ নানান বিদ্যার বিকাশ ঘটিয়েছিলো।

রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক রামও অরণ্য বাসকালে ফল মূল আহার করতেন ও তৃণশয্যায় শয়ন করতেন। তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন বানর ও নরবানরের সাথে। এরা দানবরাজ রাবণ বিজয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলো। দানবপতি রাবণের ছিলো দশমুণ্ড। দশ মুণ্ডধারী রাবণ রামজায়া সীতা হরণকালে জটায়ু নামের পাখির মোকাবিলা করেছিলো। জটায়ুকে জীবন দান করতে হয়েছিলো রামের কারণে। রাবণের লঙ্কাও ছিলো অরণ্যের অংশবিশেষ। আগুনের তাণ্ডব ঘটিয়ে হনুমান লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়েছিলো এই অরণ্যেই।

কালিদাসের শকুন্তলায় রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় এসে সুন্দরী অরণ্যচারী, মনোলোভা শকুন্তলাকে দেখে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন বলে কথিত আছে। তিনি বনের শকুন্তলাকে মৃণাল বাহুডোরে বেঁধে পর্বত থেকে সমতল অভিমুখে গমন করেছিলেন। শকুন্তলার বিদায়লগ্নে প্রকৃতির আসঙ্গ–তৃপ্ত অরণ্যচারীরা তাদের প্রিয় সাথীর আসন্ন বিরহে যে বেদনাবিধুর দৃশ্যের অবতারণা করেছিলো তা কবির বর্ণনায় ছিলো নিম্নরূপঃ

> সমস্ত প্রকৃতি শাওন মেঘের মতো দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে বৃষ্টি ঝরানোর অপেক্ষায় যেনো কাতর। মৃগদল তাদের তৃণাহার বন্ধ করে দিয়েছে। নৃত্যরত কেকী হঠাৎ বন্ধ করে যেন মৌন পাথর, তরুকুল হলুদাভ ঝরা পাতা ঝরাচ্ছে যেনো অঝোরে অশ্রুপাত হচ্ছে। সমস্ত কিছুই প্রগাঢ় শোকে মুহ্যমান।

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অরণ্যের ভূমিকা অপরিমেয়। রামায়ণ ও মহাভারতের নায়কদের বিচরণভূমি হলো অরণ্য এবং তাদের প্রায় সকল কর্মকাণ্ডই সম্পন্ন হয়েছিলো অরণ্যে। ভগবান বুদ্ধ, মহাবীর, প্রাসাদ–অট্টালিকার আরাম–আয়েস ছেড়ে অরণ্য জীবন বেছে নিয়েছিলেন শান্তির অন্বেষায়। সাধক, সন্যাসীদের

অধিকাংশই ধ্যানরত থেকেছেন অরণ্যের নির্জনতায়। তাঁরা আত্মসন্ধান করেছেন অরণ্যে বছরের পর বছর। অরণ্যবাসীরা এক সময় ব্রহ্মা (অগ্নি দেবতা) পবন (বায়ু দেবতা) ও বরুণের (বৃষ্টি দেবতা) পূজো করতো। পূজা করতো বৃক্ষ, পাথর ও জীবজন্তুর। পূজা অর্থ হলো কৃতজ্ঞতা জানানো। এসবের কাছে অরণ্যবাসীরা নানাভাবে নির্ভরশীল ছিলো।

পুরাণ ও শোক কাহিনীর প্রায় সকল ঘটনাই সংগঠিত হয়েছে আরণ্যক পরিবেশে। কল্পকাহিনীকার চটজলদি পাঠককে অরণ্য পরিবেশে নিয়ে যেতে সিদ্ধহস্ত। বনবাসে রূপবান, সাবিত্রী–সত্যবান, মহুয়া, মলুয়া, ভেলুয়া সুন্দরীসহ ময়মনসিংহ গীতিকার প্রায় সব লোককাহিনীর বিস্তারস্থল হলো গহণ অরণ্য। অরণ্য পরিবেশেই সাধু সন্যাসীরা রাজ পরিবার ও অন্যান্য সাধারণ মানুষকে শিক্ষাদান করতেন। মুক্ত মনে মুক্ত পরিবেশে শিক্ষার আদান–প্রদান হতো গুরু–শিষ্যে। শিষ্যের অগাধ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন এই অজাতশত্রু নির্লোভ চরিত্রবান গুরু। শিক্ষাশেষে ছাত্ররা শিক্ষককে সম্মান করতো গুরুদক্ষিণা দিয়ে। শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে ছিলো যুদ্ধবিদ্যা। তাতে তীর ধনুক চালানোসহ সকল প্রকার যুদ্ধাস্ত্র পরিচালনার কৌশল শেখানো হতো। গোত্রে গোত্রে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, মানুষে পশুতে যুদ্ধ ছিলো অবধারিত। ফলে এ বিদ্যা শেখানো ছিলো অপরিহার্য। ছাত্রদেরকে জাগতিক জ্ঞান দান করা হতো প্রকৃতির উদাহরণ দেখিয়ে। এসকল শিক্ষায় জীবজন্তুর উদাহরণও যখন তখন ব্যবহার করা হতো। পঞ্চতন্ত্রের গল্পের উদ্ভব তো জীবজন্তুর জীবনাচরণ বিষয়ক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে। শিক্ষক বিষ্ণুশর্মা কেবল পাখি ও জীবজন্তুর গল্প দিয়ে রাজা অম্রশক্তির তিনটি বোকা ছেলেকে শিক্ষাদান করেছিলেন। লক্ষ্য করার বিষয়, প্রতিটি গল্পের শেষে রয়েছে একটি নৈতিক উপদেশ। শশক ও কচ্ছপ (উপদেশ ঃ ধীরস্থির ও অবিচলরাই যুদ্ধ যেতে), ইঁদুর ও সিংহ (উপদেশ ঃ মস্তিস্ক পেশী শক্তিকে হার মানায়), শিকারী ও কবুতর (উপদেশ ঃ একতাই শক্তি), ব্যাঘ্র ও ব্রাহ্মণ (উপদেশ ঃ লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু) ইত্যাদি বিখ্যাত গল্পের উদাহরণ।

অরণ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে চারুশিল্প ও কারুশিল্পের অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছিলো। এসকলের কাজের প্রিয় স্থান ছিলো গুহা। মানুষ গুহায় বাস করতো এবং অবসর সময় শিল্পকর্ম করেই কাটাতো। অজন্তা, ইলোরা ও এলিফান্টা গুহার চিত্রকর্ম ও ভাস্কর্য আজো দূর ও কাছের তাবত মানুষের চোখে এক অপার বিস্ময়ের অঞ্জন পরায়। এই সকল শিল্পকর্মে ব্যবহৃত হয়েছিলো প্রাকৃতিক রঙ ও পাথর। শিল্পকর্মের বিষয় দেবদেবী, জীবজন্তু, বৃক্ষ ও নিসর্গের অন্যান্য উপাদান। এছাড়া গুহাগাত্রে ধর্মীয় বাণী

ও অনুশাসন উৎকীর্ণ করা হতো। এ থেকে সাধারণ মানুষ জীবনাচরণের নির্দেশনা পেতো। কখনো কখনো অরণ্য জীবনের ভয়াবহ দিক সম্পর্কে কল্পকাহিনীও নির্মিত হতো।

ঐতিহ্যগতভাবে কেউ কেউ অরণ্যকে জীবজন্তু ও ভূত-পেত্নীর আবাস হিসেবে বিবেচনা করতো। অরণ্য-জীবনের সমস্যা বিষয়ে সম্যক আলোকপাত করা হয়েছে মহাকাব্য রামায়ণে। রামের পিতা রাজা দশরথ সৎমাতা কৈকেয়ীর ইচ্ছা অনুসরণে পুত্র রামকে চৌদ্দ বছরের জন্যে বনে নির্বাসন দণ্ড প্রদান করেন। কৈকেয়ী তাঁর আত্মজকে অযোধ্যার সিংহাসনে দেখতে চেয়েছিলেন। রামজায়া পতিব্রতা সীতা স্বামীর সহগামিনী হতে জোর করেন। রাম অরণ্য-জীবনের কঠোর দুঃখ কষ্টের বর্ণনা দিয়ে তাঁকে সহগামী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন অরণ্য পথ কাঁকর ও উপলখণ্ডে নির্মিত, পথে ছড়ানো নানা ধরনের কাঁটা এবং এ পথ অনেক সময় খাড়া উঠে গেছে। কাজেই, এ পথ বড় দুর্গম। অরণ্যে রয়েছে রক্ত হিম করা গভীর গিরিখাত। খরস্রোতা নদী ও নির্ঝর যা মোকাবেলা করা, পাড়ি দেয়া দুষ্কর। নিকষ কালোগুহায় রয়েছে ভয়াল দর্শন অজানা ভূত-প্রেত। বন্য জীবজন্তুর রক্তজমাট করা চিৎকার দূরন্ত সাহসীর বুকেও কাঁপন ধরায়। বিশাল, বিকট দর্শন শকুন ও সাপ ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র। এদের বশীভূত করে রেখেছে এক দল দানব। এই দানবেরা বর্ণচোর। ইচ্ছেমতো অবয়ব পরিবর্তনে এরা পারঙ্গম। এরা সর্বত্র স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় ও নারী-পুরুষ ধরে নিয়ে যায় ও ভক্ষণ করে। সেখানে প্রেতাত্মাদের বাস যেখানে তাদের হাত থেকে রক্ষার অযুহাতে দানবেরা পূর্ব কল্পিতভাবে নানা বর্ণচোর রূপ ধারণ করে রাজা, শিকারী ও অন্যান্য মানুষকে প্রলুব্ধ করতো। রামায়ণে দানব মারীচ স্বর্ণ হরিণের রূপ ধরে সীতাকে প্রলুব্ধ করেছিলো এবং সীতার পাহারারত লক্ষণকে স্বর্ণ হরিণের পেছনে ছুটিয়েছিলো যাতে সন্যাসীবেশী রাবণ একাকিনী সীতাকে জোরপূর্বক ছিনতাই করার সুযোগ পায়। কোনো কোনো সময় দানবেরা জনগণ থেকে খাদ্য ও অন্যান্য উপাদান দাবি করতো। দাবি অমান্য হলে ওরা ভয়াবহ পরিণতির হুঁশিয়ারি দিতো।

একসময় অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের বনে নির্বাসনে পাঠানো হতো। ধারণা করা হতো বনে নির্বাসিত ব্যক্তি গভীর বন থেকে কোনোদিন নিষ্ক্রান্ত হতে পারবে না। এবং নির্বাসন প্রদানকারীদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বা উদ্দেশ্য সাধনে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। মহাকাব্য রামায়ণের নায়ক রাম ও তার সহোদরেরা কৈকেয়ীয় চক্রান্তে এবং মহাভারত মহাকাব্যের কুশীলব পাণ্ডবেরা কুরুদের চক্রান্তে বনে নির্বাসিত হন। তারা তাদের যৌবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছিলেন বনে-বাদাড়ে।

ঐতিহ্যগত লোক-কাহিনীতে বিজিত রাজা, অভিশপ্ত নর-নারী ও অবাধ্য শিশুকে শাস্তিস্বরূপ বনে পরিত্যাগ করা হতো। অবাঞ্ছিত ও অপছন্দের লোককে এ কারণেই বোধ করি জঙ্গলী হিসেবে গাল পাড়া হয়ে থাকে।

অরণ্য-জীবনের সমস্যা থেকে অনেকগুলো কুসংস্কারের উদ্ভব ঘটেছে। বিশেষত জীবজন্তু সম্পর্কে। গাধার কর্কশ শব্দ ও শেয়ালের তীব্রভেদী চিৎকারকে অশুভ ভাবা হয়। কারো যাত্রা পথে বিড়াল যদি রাস্তা এপার-ওপার করে তাহলে যাত্রা অশুভ হয়। অন্যদিকে, যাত্রাপথে শেয়াল বা হরিণের পাল দর্শনে শুভ হয়। ঘুমন্ত মানুষকে যদি সাপ বেড়ী দেয়, সে দীর্ঘজীবী হবে। প্রাকৃতিক অশুভ লক্ষণের সাথে যুক্ত হয়েছে নর-নারীর প্রতি সাধু-সন্তদের অভিশাপ। সাধুদের ধ্যানভঙ্গ করলে তারা মানুষকে শাপশাপান্ত করে।

অরণ্য আমাদের সভ্যতার প্রেক্ষাপট হিসেবে আদৃত হচ্ছে বহুকাল থেকে। ভারতীয়দের শতবর্ষব্যাপী জীবনচক্র চার আশ্রমে বিভক্ত। প্রতি আশ্রমের সময়-সীমা পঁচিশ বছর। জীবনের শেষ আশ্রম বা শেষ পঁচিশ বছর বনে বাসই ছিলো নিয়তি-নির্দিষ্ট। শেষ আশ্রমে তার প্রয়াস থাকবে পরমেশ্বরের সাথে যুক্তির। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ও যোগাযোগের বিস্তৃতির ফলে অরণ্য বিষয়ে অনেক পৌরাণিক কাহিনী বিনষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু অরণ্যের অজানা রহস্য এখনো আমাদের জীবনের অংশ হিসেবে আদৃত হয়ে আছে।

পৌরাণিক উপাখ্যান, প্রাচীন সাহিত্য, কাব্যে অরণ্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পেতো। অরণ্য আদিম মানুষকে যুগিয়েছে আহার, আশ্রয়। অরণ্য পৃথিবীকে দিয়েছে নির্মল বায়ু। পৃথিবীর জন্য রচনা করেছে মেঘ-বৃষ্টির কাব্য। যে কাব্য নিঃসৃত পীযূষ ধারায় বসুমতী সঞ্জীবিত ও উর্বরা হয়। উর্বরা ধরণী পৃথিবীর জীবকুলের জন্য শস্য ফলায়। আজো পৃথিবীর অধিকাংশ শিল্পকর্মে-তা চিত্রকরের তুলিতেই হোক, গ্রাম্যবালার নকশী কাঁথায় সূচের বৈগুণ্যেই হোক-আরণ্যক প্রকৃতি মূর্ত হয়ে উঠে। অরণ্য মানুষের বন্ধু, অরণ্য মানুষের ত্রাতা। এই অরণ্যই বন্যা রোধ করে। অরণ্য মরুভূমির করাল গ্রাস থেকে বাঁচায় সমৃদ্ধ জনপদকে। তাইতো সর্বত্রই অরণ্য নন্দিত, সর্বত্রই অরণ্য-প্রশস্তি। মানবসভ্যতায় অরণ্যের অবদানই সর্বাধিক। নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংসের ফলে আজ গ্রীন হাউজ এফেক্টের ভয়াবহ সম্ভাবনা বাড়ছে। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ আজ আতংকে দিন কাটাচ্ছে। কাজেই অরণ্যের প্রতি, শ্যামলী নিসর্গের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও মমতা প্রসারিত হবে এবং অরণ্যপ্রেমী মানুষ সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে বলে সঙ্গত প্রত্যাশা।

জীববৈচিত্র্য

জীববৈচিত্র্য কি

চারশ কোটি বছরে জীববৈচিত্র্যে যে বিবর্তন সাধিত হয়েছে তা পৃথিবীর এক অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রকৃতি ধ্বংস করার অর্থ হলো জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট করা। মানুষ এই পৃথিবীকে ভাড়া করা গাড়ির মতো যথেচ্ছ ব্যবহার করে নিজেদের জন্যে বড়োসড়ো বিপদ ডেকে এনেছে। লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ ও প্রাণী, অণুজীব ও এদের দেহের জিনসমষ্টি এবং জটিল প্রতিবেশ যে জীবন্ত পরিবেশ গড়ে তোলে তা-ই জীববৈচিত্র্য। জীববৈচিত্র্যের একটি অংশ হলো জীব-প্রজাতি। প্রজাতি হলো একদল বংশগতসূত্রে সদৃশ জীব, যাদের মধ্যে অন্তপ্রজনন হয় এবং উর্বর প্রজন্মের জন্ম হয়। যেমন মানুষ একটি প্রজাতি। সকল ধরনের মানুষের দেহের অভ্যন্তরীণ গঠন এবং কোষের স্বরূপ প্রায় একইরকম। যে কোনো অঞ্চলের মানুষের নারী বা পুরুষের সাথে অপর অঞ্চলের মানুষের নারী বা পুরুষ মিলিত হয়ে সন্তান উৎপাদন করতে পারে। এই সন্তানেরা নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি করে। বংশগত সূত্রে ভিন্ন তবু উভয়ের মিলনে সন্তান উৎপাদিত হতে পারে। তবে সে সন্তানদের মধ্যে মিলনে আর কোনো বংশবৃদ্ধি হয় না। যেমন ঘোড়া ও জেব্রার মিলনে যে সন্তান উৎপন্ন হয় সে সন্তানদের মিলনে কোনো সন্তান জন্মায় না। প্রজাতি প্রজাতিতে আলাদা বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ধরা পড়ে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের গরমিল এতোই সূক্ষ্ম যে তা ধরা খুব মুশকিল। পৃথক পৃথক ভৌগোলিক সীমায় স্থিত সর্বমোট প্রজাতিসমূহের মধ্যেই সাধারণত জীববৈচিত্র্য পরিমাপ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি প্রজাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এবং প্রজাতির সদস্যদের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। অনেক প্রজাতি নির্দিষ্ট ইকোসিস্টেম বা প্রতিবেশে জীবনধারণ করে থাকে। কাজেই জীববৈচিত্র্যের আলোচনায় স্পষ্ট তিনটি এলাকা চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যেমন-১. বংশগতি বৈচিত্র্য, ২. প্রজাতি বৈচিত্র্য ও ৩. প্রতিবেশ বৈচিত্র্য।

প্রজাতি বৈচিত্র্য বিষয়ে পূর্বে ধারণা দেয়া হয়েছে। বংশগতি বৈচিত্র্য নির্ণায়ক উপাদান হলো জিন। জিন হচ্ছে জৈবরাসায়নিক গুচ্ছ যা প্রজন্মের ভৌতিক ও জৈব-রাসায়নিক চারিত্র্য নির্ধারণ করে। চরিত্রবাহী জিনসমূহ পিতামাতার দেহ থেকে সন্তানে পরিবাহিত হয় যদিও অধিকাংশ জিন সমান বৈশিষ্ট্যবাহী (যে কারণে সন্তান পিতামাতার অনুরূপ হয়)। কোনো কোনো জিনের মধ্যে সূক্ষ্ম বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন দেখা যায় দেহের আকারে ও রঙে। অনেক সময় বৈসাদৃশ্য সরাসরি দেখাও যায় না যা রোগের প্রতি স্পর্শকাতর। এ ধরনের জিন-বৈচিত্র্যের ফলে নূতন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব ঘটে। বন্য পরিবেশে এসকল জীব ক্রমে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়।

প্রতিবেশ-বৈচিত্র্য উদ্ভিদ ও প্রাণী গোষ্ঠীসমূহ এবং পরিবেশের অজৈব উপাদান (মাটি, পানি, খনিজ, বায়ু ইত্যাদি) নিয়ে গঠিত। গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে এবং গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে কার্যকরী সম্পর্ক এবং পরিবেশের সাথে এদের সম্পর্ক এক জটিল প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ নেয় পানিচক্র, মৃত্তিকা গঠন, পুষ্টি-চক্র ও শক্তি প্রবাহ। এরা জীব সম্প্রদায়কে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপাদান যোগায়। ফলে জীব ও অজৈব উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। জীববৈচিত্র্যের দুটি লক্ষণীয় দিক আছে। এক. বিভিন্ন প্রতিবেশের মধ্যে বিচিত্র ধরনের প্রজাতি ঃ প্রতিবেশ বৈচিত্র্য যতো বাড়ে ততো অধিক প্রজাতি দেখা যায়। দুই. নির্দিষ্ট জীব ভৌগোলিক বা রাজনীতিক সীমারেখার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেশ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

জীববৈচিত্র্য কোথায় ঘটে

জীববৈচিত্র্য এমনকি মরু বুকে, তুন্দ্রাঞ্চলের বরফাচ্ছাদিত অঞ্চলে এবং গন্ধক-ঝর্ণায়ও হতে পারে। কারণ জীব এ ধরনের কঠিন পরিবেশেও জীবন-পরিক্রমা চালিয়ে থাকে। পৃথিবীর সর্বত্র জীবের অবস্থান সমান নয় এবং জীববৈচিত্র্যও কোথাও বেশি কোথাও কম ঘটে থাকে।

প্রতিবেশ নির্মাণে উদ্ভিদের ভূমিকাই মুখ্য। উদ্ভিদ সৌরশক্তির সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনকে পানির সাথে মিশিয়ে নিজেদের জন্যে শক্তি মজুদ করে। বিশেষ করে কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার যোগাড় করে। যে অঞ্চল উষ্ণ ও ভেজা, উদ্ভিদ সেখানেই বেশি জন্মায়। ফলে আর্দ্র উষ্ণমণ্ডলেই উদ্ভিদবৈচিত্র্য অধিক দেখা যায়। প্রাণীর মূল খাদ্য উৎস হলো উদ্ভিদ। সঙ্গতকারণে যেখানে উদ্ভিদবৈচিত্র্য বেশি

সেখানেই প্রাণী–বৈচিত্র্য অধিক। উষ্ণমণ্ডলের উষ্ণতা ও আর্দ্রতার হ্রাস–বৃদ্ধির ওপর জীববৈচিত্র্য নির্ভর করে।

উষ্ণমণ্ডলে কতিপয় অঞ্চলে ব্যতিক্রম হিসেবে অত্যধিক জীববৈচিত্র্য চোখে পড়ে। এর কারণ বিশেষ জলবায়ু বা ভৌগোলিক অবস্থা অথবা দীর্ঘস্থায়ী জলবায়ু ও অপরিবর্তনীয় ভৌতিক অবস্থা। বরফ যুগে সমুদ্র স্তরের উত্থান–পতন ঘটেছে। ফলে উষ্ণমণ্ডলীয় কতিপয় অরণ্য বন্যাপ্লাবিত হয়েছে এবং শুকিয়ে গেছে। অক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলসমূহে কিছু কিছু প্রজাতি অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। আজকে যে জীববৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে তা ওসবেরই সম্প্রসারণ।

কাজেই উষ্ণমণ্ডলে স্থলের প্রতিবেশে বড়ো ধরনের বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটে বিশেষত উষ্ণমণ্ডলীয় ভেজা অরণ্যে। কেবল শুষ্ক স্থলভাগে জীববৈচিত্র্য সীমাবদ্ধ নয়, সমুদ্র ও উপকূল অঞ্চলেও বিভ্রান্তি উৎপাদক জীববৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

সমুদ্রের মুক্ত বুকে ভাসমান রয়েছে অণু–উদ্ভিদ ও আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ। এগুলো অণু–প্রাণীর খাদ্য। বড়ো প্রাণী খায় অনুপ্রাণীকে। এই অণু–প্রাণীরা মরে গেলে সমুদ্রের তলায় জমে এবং দেহের পুষ্টি–নির্যাস তলদেশে আটকা পড়ে যেখানে সূর্যালোক পৌঁছায় না।

উষ্ণমণ্ডলীয় সাগরে স্বচ্ছ অগভীর উষ্ণ জল প্রবালপ্রাচীর গড়ায় সাহায্য করে। প্রবাল–প্রাচীর গড়ার মধ্য দিয়ে পুষ্টি–চক্র আবর্তিত হয় এবং সারা বছর ধরে অধিক উৎপাদন হতে থাকে। পুষ্টির অবিরাম সরবরাহ এবং প্রবাল কীটের উষ্ণ স্থায়ী অবস্থা এক ধরনের জীববৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, যেমনটি উষ্ণমণ্ডলীয় আর্দ্র অরণ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

সেখানে জীববৈচিত্র্য কতখানি

বংশগতি বৈচিত্র্যের পরিমাণ নিরূপণ সম্ভব নয়। জিন পরীক্ষণ–বিজ্ঞানের শৈশব এখনো অতিক্রান্ত হয় নি। একটি প্রজাতির মধ্যে জিন বিবিধায়ন কেবল ভৌতিক চারিত্র্য বা জৈবরাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব।

প্রজাতি স্তরে বৈচিত্র্য সম্পর্কে সামান্য জানা থাকলেও সর্বমোট প্রজাতির সংখ্যা অনুপাতে তা অতি নগণ্য। প্রজাতি বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতার পরিসীমা নেই। সম্প্রতি সংকলিত এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রেণীবিন্যাসকরণ বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত কেবল ১৪ লক্ষ জীবিত জীব সনাক্ত করেছে এবং নামকরণ করেছে। এর মধ্যে প্রাণীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ৩ হাজার এবং উচ্চতর উদ্ভিদ ২ লক্ষ ৪৮ হাজার। এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান

খুবই সংকীর্ণ। বিজ্ঞানীরা কেবল পাখি ও স্তন্যপায়ী (৯০০০ ও ৪০০০ প্রজাতি) প্রাণীর প্রায় সকল প্রজাতি চিহ্নিত করায় সফল হয়েছেন। শেষোক্ত দুটি পর্বে মোট জানা প্রজাতির মাত্র শতকরা এক শতাংশ প্রজাতির অস্তিত্ব রয়েছে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ প্রজাতির জীব আছে বলে অনুমিত হচ্ছে তার কাছে ১৪ লক্ষ প্রজাতির হিসাব কি পর্যাপ্ত ?

যে সকল প্রজাতি সম্পর্কে অধিক জানা গেছে তাদের কথা ধরা যাক। সম্ভবত এ পর্যন্ত শতকরা ৮০ ভাগ বা তারও বেশি মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। উচ্চতর উদ্ভিদ বিষয়ে জানাও মোটামুটি সন্তোষজনক। তবু শতকরা ১৫ ভাগ এখনো জানার বাকি আছে বলে ধারণা। কেউ বলতে পারেন পোকামাকড় সম্পর্কেও জানার পরিমাণ কম নয়। যেহেতু প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ পোকামাকড় সনাক্ত করা হয়েছে। ২৫ বছর আগে সি.বি. উইলিয়ামস ৩০ লক্ষ পোকামাকড় আছে অনুমান করেছিলেন। বহু বছর ধরে বিজ্ঞানীরা এই হিসাব মেনে নিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা, এই সংখ্যা ৪০–৫০ লক্ষ ছাড়িয়ে যেতে পারে। পরবর্তীতে নব সনাক্তকরণ পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্য অন্বেষণের বৈগুণ্যে নতুন উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এখন মনে করছেন পোকামাকড়ের প্রজাতি সংখ্যা কোটি ছাড়িয়ে যাবে। ১৯৮২ সনে পূর্বে অবহেলিত ক্যানোপি অরণ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে পোকামাকড়ের এক নতুন জগৎ আবিষ্কৃত হয়। সারা পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্যে অনুসন্ধান চালালে পোকামাকড়ের প্রজাতির সংখ্যা তিন কোটি অতিক্রম করবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

উপরিলিখিত উপাত্ত বিবেচনায় আমরা নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তে আসতে পারি ঃ

ক. প্রদত্ত বর্ণনা সত্যি হলে হাজার হাজার জীববিজ্ঞানী কয়েক যুগ ধরে অনুসন্ধান করে পৃথিবীর মাত্র শতকরা ৫ ভাগ প্রজাতি সনাক্ত করেছেন।

খ. গত দুই দশকে পূর্বেকার সমস্ত ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করেছে এবং প্রজাতির সংখ্যা সম্বন্ধে জানা অনেক বেড়েছে। নতুন গবেষণায় যেখানে জানার হার কমে আসার কথা সেখানে তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এতে বোঝা যায় বিজ্ঞানীদের অনুমান কতোখানি অসার।

গ. প্রজাতিকে দলে বিভক্ত করে যথার্থভাবে গবেষণা করে প্রজাতির সংখ্যা অনুমিত হয়েছে। কম জানা গেছে এমন অমেরুদণ্ডী প্রাণী, নিম্নতর উদ্ভিদ ও অণুজীব গবেষণার অগ্রগতিতে দেখা যাচ্ছে যে পূর্বের ধারণার ব্যাপক পর্যালোচনা আবশ্যক।

জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে কি ঘটছে?

প্রাকৃতিক নির্বাচনে স্বাভাবিক কারণে কোনো কোনো প্রজাতির জীব লুপ্ত হয়ে যায়। জীবাশ্ম গবেষণায় দেখা যায় যে, চারশ' কোটি বছর আগে ব্যাকটেরিয়া ও নীল-সবুজ এলগীর রূপে জীবনের আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তী তিনশ' কোটি বছর ধরে ধীরগতিতে বিবর্তন ঘটতে থাকে। পরে একসময় প্রচণ্ড গতিতে জীববৈচিত্র্য ঘটতে শুরু করে এবং জীব-জগতের প্রধান দলসমূহের উদ্ভব ঘটে। একদিকে জীবনের বিচিত্র সমারোহ, নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব, অন্যদিকে প্রাচীন প্রজাতিসমূহের বিলুপ্তি সমানতালে চলতে থাকে। গড়ে কোনো প্রজাতি ৫০ লক্ষ বছরের বেশি টিকে থাকতে পারেনি। ফলে পৃথিবীর জীবকুলে বহুবার বহুরূপে পরিবর্তনের ধাক্কা লেগেছে। বিলুপ্তি কখনো সমানতালে ঘটে নি। মাঝে মাঝে ভয়াবহ গণবিলুপ্তিও ঘটেছে। এতে পৃথিবীর অর্ধেক জীবেরই হয়তো বিনষ্টি ঘটে থাকবে। তবে বেশিরভাগ সময়েই প্রজাতির উদ্ভব ও বিনাশের মধ্যে সমানুপাত লক্ষ্য করা যায়। প্রতি একশ' বছরে গড়ে ৯০টি প্রজাতি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারাতেই ওদের বিলুপ্তি ঘটে। তার জায়গায় আসে নতুন প্রজাতি। পৃথিবী তার ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধুনা এ রূপে এসে দাঁড়িয়েছে। তাতে সর্বশেষ সংযোজিত হয়েছে মানুষ নামের এই প্রজাতি।

প্রকৃতি আপন নিয়মে ধ্বংস ও সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করে আসছিলো। কিন্তু কয়েকশ' বছর ধরে সম্প্রতি মানুষের খবরদারিতে জীব-বিলুপ্তির হার আশংকাজনকভাবে বেড়ে গেছে। বিগত ৪০০ বছরে পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর ৪০০ প্রজাতি ও উপপ্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই হার ক্রমেই বাড়ছে। ১৭ শতকে প্রতি পাঁচ বছরে একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হতো। অথচ ২০ শতকে প্রতি দুই বছরে একটি প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে। বাহুল্য বলা যে পাখি ও স্তন্যপায়ী সমগ্র জীবজগতের এক শতাংশ মাত্র। তাও আমাদের জানা প্রজাতির সংখ্যা বিচারে। সকল জীবের কথা জানা গেলে এই হিসাব আরো নগণ্য হয়ে দাঁড়াবে। এই হিসাবকে নির্ণায়ক বিবেচনা করলে সার্বিক জীববৈচিত্র্যে কী অপরিমেয় ধ্বংস সাধিত হচ্ছে তা ভাবতেই বুক কেঁপে ওঠে। বিজ্ঞানীরা একমত যে জীব-বিলুপ্তি সম্পর্কে তাঁরা পূর্বে যা বিশ্বাস করতেন জীব-বিলুপ্তির হার তারচেয়ে অনেক বেশি। উর্বর ও ঘনবসতিপূর্ণ আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে গণবিলুপ্তি আসন্ন বলে তাঁরা মনে করছেন এবং এ জন্যে মানুষের অবিমৃষ্যকারিতাকেই দায়ী করছেন। তাঁরা বিশেষ করে উষ্ণমণ্ডলীয় আর্দ্র অরণ্যের দিকেই পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেখানে জীববৈচিত্র্যের আধিক্য রয়েছে।

উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্য রয়েছে পৃথিবীর শতভাগের চৌদ্দ ভাগ জায়গা জুড়ে। অথচ পৃথিবীর জীবকুলের ন্যূনপক্ষে অর্ধেক জীব এ সকল অরণ্যের বাসিন্দা। এসব জীবের অধিকাংশই আমাদের অজানা। পৃথিবীতে ১ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গকিলোমিটারে এ ধরনের অরণ্য ছিলো। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ের হিসেবে দেখা গেছে, এক কোটি বর্গকিলোমিটার উষ্ণমণ্ডলীয় আর্দ্র অরণ্যের অস্তিত্ব আছে। প্রতিবছর এর শতকরা এক ভাগ অরণ্য কৃষি বা বসতভিটায় পরিণত হচ্ছে। আমেরিকা ইতোমধ্যে ৫৪% জলাভূমি হারিয়েছে। নিউজিল্যাণ্ড হারিয়েছে ৯৪%। বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যাণ্ড ও ভিয়েতনাম মিঠাপানির জলাভূমি হারিয়েছে ৯০%।

যুক্তরাজ্য পৃথিবীময় জরিপ করে যে উপাত্ত উপস্থাপন করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ৫০ হাজার উচ্চতর উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে প্রায় ২০ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ বিলুপ্তির পথে। এই সংখ্যা আমাদের জানা শতকরা ৩০ ভাগ উদ্ভিদ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। যদিও সম্ভবত পৃথিবীর মাত্র শতকরা ৫ ভাগ উদ্ভিদ বিষয়ে আমরা জানতে পেরেছি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক হিসেবে জানিয়েছে যে, দুই হাজার সনের মধ্যে আমাদের জানা প্রজাতিসমূহের মধ্য থেকে শতকরা ১৫-২০ ভাগ প্রজাতি হারিয়ে যাবে। যদি ধরে নেয়া হয় যে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ ও প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা ১ কোটি দাঁড়াবে, তাতে দু' হাজার সন অতিক্রমণের সময় যথাক্রমে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার উদ্ভিদ ও ২০ লক্ষ প্রাণী প্রজাতি চিরতরে হারিয়ে যাবে। আর এক হিসেবে আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংস্থা জানাচ্ছে ২,০৫০ সনের মধ্যে ৬০,০০০ উদ্ভিদ হয়তো বিলুপ্ত হবে বা বিলুপ্তির মুখোমুখি দাঁড়াবে। বিলুপ্তির ধারা অনুযায়ী একটি উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্ত হলে ১০-৩০ প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্ত হয়। সে হিসেবে প্রাণী প্রজাতির বিলুপ্তির সংখ্যা দাঁড়াবে ৬,৬০,০০০ থেকে ১৮,৬০,০০০।

এটি আনুমানিক মোটা হিসাব। তবু এতে প্রজাতিসমূহের বিলুপ্তির একটা সহজ ধারণা পাওয়া সম্ভব। প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় যে হারে প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটতো তার থেকে গত চারশ' বছরে গড়ে ২৫,০০০ গুণ বেশি প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে চলেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এটি একটি ভয়াবহ চিত্র। ঘর পুড়লে নিরো বাঁশি বাজাতে পারেন। নিরো সংসার-উদাসী ভাবুক চিত্তের মানুষ। কিন্তু সমাজ-সচেতন কোনো মানুষের পক্ষে বিচলিত বোধ না করে উপায় নেই। নতুন প্রজন্মের হাতে আমরা কোন্ বিশ্বকে উপহার দিয়ে যাচ্ছি তা প্রতিটি বিবেকবান মানুষকে ভাবতে হবে। চিত্ত ও বিত্তের যার যা সম্বল আছে তা নিয়ে এই হুতাশনকে রোখার চেষ্টায় প্রাণপাত সংগ্রামে নিবেদিত হতে হবে।

সারণি এ পর্যন্ত সনাক্তকৃত জীবের সংখ্যা সারণিতে প্রদত্ত হলো (১৯৮৮ সনে ই.ও. উইলসন প্রদত্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে)ঃ

দল	প্রচলিত নাম	সর্বমোট
ভাইরাস	ভাইরাস	১,০০০(অনুমিত)
মোনোরা	ব্যাকটেরিয়া ও নীল–সবুজ এলগী	৪,৭৬০
ফাঞ্জি	ফাঞ্জি	৪৬,৯৮৩
এলগী	এলগী	২৬,৯০০
প্ল্যান্ট	নিম্নতর উদ্ভিদ	২৮,৪২৮
	উচ্চতর উদ্ভিদ	২,২০,০০০
প্রোটোজোয়া	প্রোটোজোয়া	৩০,৮০০
ইনভার্টিব্রাটা বা অমেরুদণ্ডী	নিম্নতর অমেরুদণ্ডী	১,০৬,৩০০
	পতঙ্গ	৭,৫১,০০০
	অন্যান্য সন্ধীপদী	১,২৩,১৬১
	অন্যান্য অমেরুদণ্ডী	৯,৩০০
কর্ডাটা	নিম্নতর মেরুদণ্ডী	১,২৭৩
	মাছ	১৯,০৫৬
	উভচর ও সরিসৃপ	১০,৪৮৪
	পাখি	৯,০৪০
	স্তন্যপায়ী	৪,০০০
সর্বমোট		১৩,৯২,৪৮৫

জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করা হচ্ছে কিভাবে?

মুখ্য কারণ অবনীকরণ। জনবিস্ফোরণ ঘটছে অবিশ্বাস্যভাবে। বিশাল এই মানবগোষ্ঠী অবনীকরণে বাধ্য হচ্ছে। কারণ খাদ্যের জন্যে জমি দরকার, খাদ্য পাক করার জন্যে জ্বালানি হিসেবে কাঠ দরকার, বসতি গড়ার জন্যে জমি প্রয়োজন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্যে ভূমি থেকে খনিজ সম্পদ উত্তোলন আবশ্যক এবং শিল্প কারখানা গড়ার জন্য জমি দরকার। বিনোদনের জন্যেও চাই কিছু অনাবাদি জমি। উপরের সব কাজের জন্যে জমি সংগৃহীত হচ্ছে বনাঞ্চল থেকে বা জলাভূমি ভরাট করে। ফলে প্রতিবেশের

ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। অরণ্য সম্পদ ও বন্য প্রজাতিসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এই ধ্বংসের হার অসম্ভব রকমের বেশি। ধারণা করা হচ্ছে যে, বাড়তি জনসাধারণ পৃথিবীর মোট ৪০ ভাগ উৎপাদন গ্রাস করছে। এই জনসংখ্যা পরের শতকে দ্বিগুণ হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ও অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণী জলাভূমির ওপর নির্ভরশীল। স্থলভাগের আবহাওয়ার ভারসাম্য রক্ষায়ও এর ভূমিকা অপরিসীম। অরণ্য বৃষ্টি সৃজনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। প্লাবন রোধ করে। বন্য জীবজন্তুকে আশ্রয় দেয়। বিশেষ করে গহীন ঘন অরণ্য ছাড়া বড় জন্তু টিকতে পারে না। পৃথিবীতে দূষণ সমস্যা প্রকটরূপ ধারণ করেছে। এটি পৃথিবীর বায়ু, জল ও মাটিকে জীবের বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে। সারা পৃথিবী বর্তমানে অম্ল বৃষ্টির শিকার। কৃষিজমির কীটনাশক ও অন্যান্য রাসায়নিক বর্জ্য, কল–কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য জল ও স্থলভাগের পানিতে দূষণ ছড়াচ্ছে। দূষিত পানি ভূগর্ভেও প্রবেশ করছে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই–অক্সাইডের আধিক্য ওজোন স্তরের ঘনত্ব হ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে যে গ্রীন হাইজ এফেক্ট সৃষ্টি হচ্ছে তাতে পৃথিবীর আবহাওয়া ক্রমেই উষ্ণ হয়ে উঠছে যা জীব টিকে থাকার প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে মদদ যোগাচ্ছে।

নির্বিচার বনজ সম্পদ ধ্বংস, পশুপাখি ও মৎস্য শিকারও জীব–বিলুপ্তির আরেকটি বড় কারণ। মানুষ তাদের বাসগৃহ নির্মাণ, জ্বালানি, আসবাবপত্র ও শিল্প পণ্য উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ কাঠ, বাঁশ ধ্বংস করেছে সে পরিমাণ গাছপালা, বাঁশ বা বনজসম্পদ উৎপাদনে মনোযোগী হচ্ছে না। মাংস, চামড়া, পালক, শিং আহরণের জন্যে বন্য পশুপাখি নিধন চলছে সর্বত্র অহরহ। সমুদ্রে, নদীতে মাছ, ডলফিন, তিমি মারা হচ্ছে যথেচ্ছভাবে। আইন করেও এ প্রবণতা রোধ করা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশে অরণ্য ও জলাভূমি ধ্বংসের কারণে জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। কৃষি জমি ও বসতভিটার জন্যে বনাঞ্চল পরিষ্কার করা হচ্ছে। বনে আগুন লাগানোর ফলে পশুপাখি ভীত–সন্ত্রস্থ হয়ে আবাসচ্যুত হচ্ছে এবং অপরিচিত পরিবেশে আশ্রয় পেলেও মারা পড়ছে অনেকে। উদ্ভিদ প্রজাতি তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জীবনের পরিণতি অনুভব করছে। সঙ্গে ছোটখাট জীবকুলও। জলাভূমি থেকে সেচ কাজের জন্যে পানি উত্তোলন করা হচ্ছে। ফলে জলাভূমি শুকিয়ে যাচ্ছে। জলাভূমি ছিলো মাছ শামুক ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পাখিরাও বড় বড় জলাভূমি ব্যবহার করতো। সমুদ্র ও নদী উপকূলে বাঁধ গড়ে তোলার ফলে প্রতিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে।

বাংলাদেশের জন্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অভূতপূর্ব জনবিস্ফোরণ। এটি সমগ্র এশিয়া মহাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পৃথিবীর সমগ্র ভূ-ভাগের মধ্যে এশিয়ার ভাগে পড়েছে মাত্র ১৩ শতাংশ। অথচ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বাস মাত্র এই ১৩ শতাংশ ভূখণ্ডে। এশিয়াতে প্রতি বছর ৬ কোটি লোক বাড়ছে।

দারিদ্র্য জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। জঠর জ্বালা বড় জ্বালা। তদুপরি অধিকাংশ জনসাধারণ দারিদ্র্যের কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। অশিক্ষিত, ভুখা মানুষ কি যে অনর্থ ঘটাচ্ছে সে নিজেও তা জানে না। তাঁরা স্বাস্থ্য বিষয়ে, দূষণ বিষয়ে সচেতন নয়। ফলে পরিবেশের অবনতি ঘটানোয় এরা যে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে সে বিষয়টিও তাদের বোধগম্য নয়। সরকারেরও সুষ্ঠু ও সমন্বিত নীতিমালা নেই। উন্নত দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বনায়ন, সেচ, বাঁধ নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন ব্যবস্থা, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করে স্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সেসব দেশে সরকারের বদল হয় কিন্তু এসব ক্ষেত্রে নীতি বদল হয় না। এখানে ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে বিবেচনায় রাখা হয়। ফলে কোনো নীতি সুস্থভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা এতদ্দেশীয় সরকারসমূহের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বার বার। অর্থাৎ এরা কখনোই এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। তাঁদের বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে দেখা যায় নি। তাঁদের প্রয়াস সভা, সেমিনার, বিবৃতির মধ্যেই মূলত সীমাবদ্ধ থাকে। ছোট একটি উদাহরণ এ সত্যকে বুঝতে সহায়ক হবে। কেবল প্রজনন ক্ষেত্র ও নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবে বাংলাদেশে ৩০% মাছ, ২০% উভচর প্রাণী, ৩০% সরীসৃপ ও ৩০% পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

জীববৈচিত্র্য রক্ষার উপায়

মানুষের আহ্নিক ও বার্ষিক জীবন-পরিক্রমায় নানা ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ যে নিরন্তর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে সে বিষয়ে তাকে সচেতন করে তোলা জরুরি কাজ। এ কাজটি তেমন জটিল নয়। মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও তাকে প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে পারলে কাজ হবে। কি করে বোঝাবেন, তাতে কোন্ মাধ্যম ব্যবহার করবেন, তার জন্যে সুষ্ঠু চিন্তাভাবনা করা দরকার। লোকদেখানো দায়সারা কাজে কেবল অর্থব্যয়ই সার। ৬.১২.৯৩ তারিখে প্রচারিত একটি টিভি অনুষ্ঠানের উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধে হবে। 'অঙ্গীকার' শিরোনামের অনুষ্ঠানটি পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক। তাতে

যাঁদেরকে বক্তব্য শোনানোর জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হলো এবং তাঁরা যা বক্তব্য দিলেন তাতে জনবিস্ফোরণের উৎস ও নিরাময় সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে (যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন) কোনো ধারণা সৃষ্টি করতে পারলেন বলে মনে হলো না। যাঁরা বক্তব্য দিলেন তাঁরাও আসলে কী বলবেন, তার কোনো প্রাক-প্রস্তুতি ছিলো বলে একবারও মনে হয় নি। সর্বশেষ বক্তা অবশ্য একটি আবেগপ্রবণ অনুরোধ জানালেন যা তাঁর ভক্তদের মধ্যে এক ধরনের সাময়িক আলোড়ন তুলতে পারে। কাজেই, মাধ্যমকে কিভাবে ব্যবহার করা হবে সে বিষয়ে সমন্বিত সুষ্ঠু পরিকল্পনা অপরিহার্য। বন্যজন্তু, বনজ সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্যে কঠোর আইন জারি এবং তা বাস্তবায়নের জন্যে নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রাখা আবশ্যক। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পরিবেশ ও প্রতিবেশকে কিভাবে রক্ষা করা সম্ভব তার জন্যে কৃষক, সাধারণ মানুষ, জেলে, বনকর্মী, কল-কারখানার শ্রমিক, বস্তিবাসীকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা চাই। এ কাজে সরকার সকল প্রকার গণমাধ্যম ও সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মীদেরকে নিয়োগ করবেন। তার সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করবেন। সকল রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মসূচির মধ্যে একে প্রাধিকার দেবেন। জীববৈচিত্র্য রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবার পরিকল্পনা কাজকে একযোগে সমন্বিত করতে পারেন। দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের জনগণ যাতে উৎসাহিত বোধ করেন-এর জন্যে কিছু বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা রাখা সমীচীন। যেমন, জ্বালানির জন্যে কাঠ ব্যবহার না করার উপদেশ দিলে তা জনগণ মানবে কি করে ? বিকল্প সস্তা সহজলভ্য জ্বালানির ব্যবস্থা না থাকলে বৃক্ষ নিধন বন্ধ হবে না। সরকার, সরকারের বাইরের রাজনৈতিক সংগঠন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যদি এখনি সমস্যা সমাধানে নেমে না পড়েন তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে আমরা যে পৃথিবীকে উপহার দিয়ে যাবো তা বাসের যোগ্য হবে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবিতপূর্ণ উন্নতি সত্ত্বেও পৃথিবী ভাবী মানব শিশুর জন্যে সুস্থ, স্বস্তিকর ও শান্তিময় পরিবেশের নিশ্চয়তা দিতে পারবে না।

লোকচিকিৎসা

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সুরসিক গোপাল ভাঁড়কে প্রশ্ন করেছিলেন, 'গোপাল বলুন তো, এ রাজ্যে কোন্ পেশার লোক সংখ্যায় বেশি' । গোপাল উত্তরে বলেছিলেন, 'চিকিৎসা-পেশা' । রাজা বিস্ময়ে হতবাক। যে রাজ্যে ফি বছর শত শত লোক চিকিৎসকের অভাবে বিনাচিকিৎসায় মারা যায় সে রাজ্যে কিনা বেশির ভাগ লোক চিকিৎসা-পেশায় নিয়োজিত। গোপাল তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে জোরালো প্রমাণ হাজির করেছিলেন। সে গল্প আপনাদের অজানা নয়।

রসিক রাজ গোপাল পরিহাসচ্ছলে কথাটি বলেছিলেন বটে, কিন্তু এর থেকে একটি সহজ ও অকপট তথ্যের সন্ধান আমরা পেয়ে যাই। যা আজকের দিনেও ভীষণভাবে সত্য। বয়সে ছোট কি বড় প্রতিটি মানুষ চিকিৎসা বিষয়ে কিছু না কিছু ধারণা রাখে। আমাদের চতুষ্পার্শ্বে যেসব উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ ও ধাতব ভেষজ রয়েছে সেসব বিষয়ে কিছুটা জ্ঞান রাখে। আপনার ঠাকুর্দা যখন ছোট ছিলেন, তিনি খেলতে গিয়ে হাত-পা ছিঁড়ে গেলে অবশ্যই মুখের থু থু, দুর্বার রস, আসামী লতার রস বা গাঁদা ফুলের পাতার রস লাগাতেন। যে ধরনের চিকিৎসার অন্য নাম আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা। আপনার দাদুর অনুরূপ অবস্থায় আপনার সন্তান উল্লিখিত ভেষজ-এর পরিবর্তে জামবাক, বোরোলীন, বাটালী বাম বা অন্য এন্টিসেপটিক মলম, ডেটল, সেপনিল লাগাবে। এসব অ্যালোপ্যাথি শাস্ত্রের ওষুধ। আপনার ঠাকুর্মা বা দিদিমা হাতে আগুনের আঁচ লাগলে হাত আগুনের তাপেই সেঁকতেন। সদৃশকে সদৃশ দ্বারা মোকাবিলার কৌশল সে সময়ও তাঁদের জানা ছিলো। এরই নাম হোমিওপ্যাথি। আজ আপনার বোন বা স্ত্রী এমতাবস্থায় প্রথমে একই পদ্ধতি হয়তো অনুসরণ করবেন নতুবা ডিমের অ্যালবুমেন, পিঁয়াজের রস, ক্যান্থারিস বা আর্টিকেরিয়া ইউরেন্সের আরক লাগাবেন। অথবা বার্নলের সাহায্য নেবেন। পেট খারাপ, সর্দি-কাশ, মাথা ব্যথা ইত্যাদির প্রাথমিক চিকিৎসা কম-বেশি সবার জানা। প্রশ্ন উঠতে পারে একে চিকিৎসা বলা যাবে কি না। অত্যন্ত সংগত প্রশ্ন। চিকিৎসা মানে কতকগুলো ওষুধ প্রয়োগ নয়। Art of healing বা ওষুধ প্রয়োগের কৌশলই হলো চিকিৎসা। কিন্তু আদিকালে প্রণালীবদ্ধ

চিকিৎসা শাস্ত্র তো ছিলো না। আজকাল হয়তো প্রণালীবদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসক পাওয়া সহজ। কাজেই তাঁদেরকে ঠেকায় পড়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে হয়েছে আবহমানকাল থেকে। কেন ? শিখতে হয়েছে সুস্থ ও সবলভাবে বেঁচে থাকার জন্য, বিজয়ের সংগ্রামে উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জনের জন্য।

প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ উদ্ভাবন করে। সমস্ত সৃষ্টির মূলে রয়েছে মানুষের দৃশ্য–অদৃশ্য প্রয়োজন। প্রয়োজনটা কি ? সেটা মানুষের অভাববোধ। প্রকৃতির সন্তান মানুষ একদিন দেখলো হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার দরকার। গায়ের জোরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় তাকে হার মানতে হয়েছে। তাছাড়া বুদ্ধি থাকতে সে পশুর কায়দায় চলবেই বা কেনো ? পশুর সাথে মানুষের তফাৎ এখানেই। মানুষ অনুসন্ধিৎসু; যা পশুর নেই। শরীরের শক্তি দিয়ে পশুশক্তির মোকাবিলার বদলে মানুষ অন্য উপায় খুঁজলো। তার হাতে জন্ম নিলো অস্ত্র। এবড়োখেবড়ো চোখা পাথর আর ফলা যার প্রথম রূপ। মানুষ সংখ্যায় বাড়লো, সে সংগে বাড়লো খাদ্যের চাহিদা। খাদ্য সমস্যা মিটানোর জন্যে কৃষির জন্ম। অস্ত্র দিয়ে কৃষিকে বন্যপশু থেকে রক্ষা করা সম্ভব হলো। অপর দলের আগ্রাসন থেকে তাঁকে রক্ষা করলো অস্ত্র। পাথর ছুঁড়তে গিয়ে কিংবা পাথরকে পাথর দিয়ে ঘষে অস্ত্র বানানোর সময় লাল কি একটা পদার্থ আকাশের বিদ্যুতের মতো ঝলক দিয়ে গেলো। দাবানলের সাথে তাদের পরিচয় তো ছিলোই। কিন্তু এর উৎস জানা ছিলো না। ঘর্ষণজাত লাল পদার্থ বিস্ময়ের ঢেউ তোলে মনে। মন অনুসন্ধিৎসু হয়।

মানুষ আগুন উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করে। এই সন্ধানী মনই অসুস্থ, আহত দেহকে সারিয়ে তোলার জন্যে তাদের চর্তুষ্পার্শ্বের লতাপাতা, শিকড়, বাকল, ফল–মূল, প্রাণীর মলমূত্র, হাড়গোড় ও ধাতব বস্তুর মধ্যে দৃষ্টি চালায়। এভাবে মানুষ দিনে দিনে এসব ভেষজের নিষ্কাশন ও প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ত করে। আজকের দিনে যা প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে গণ্য হতে পারে। এ বিষয়ে মানুষ পরস্পর অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। অভিজ্ঞতার সার তত্ত্বের রূপ নেয়। চিকিৎসার কাজে মানুষ কেবল ভেষজের উপর নির্ভর করতে ও আস্থা রাখতে পারতো না। কারণ প্রায়সময় বাঞ্ছিত ফল লাভে ব্যর্থতা আসতো। তাই মানুষ রোগকে পরাভূত করার জন্যে মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁক, যাদুকেও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতো। ভেষজ ব্যবহারের আগে আদিযুগে মন্ত্রতন্ত্র, যাদুই ছিলো আদি চিকিৎসা ব্যবস্থা। সাম্প্রতিককালে চিকিৎসকদের সুবচন ও সম্মোহনবিদ্যা যার পরিশীলিত রূপ বলে ধারণা।

সমগ্র বিষয়টিকে চিত্রলেখ–এর মাধ্যমে এভাবে উপস্থাপন করা যায় ঃ

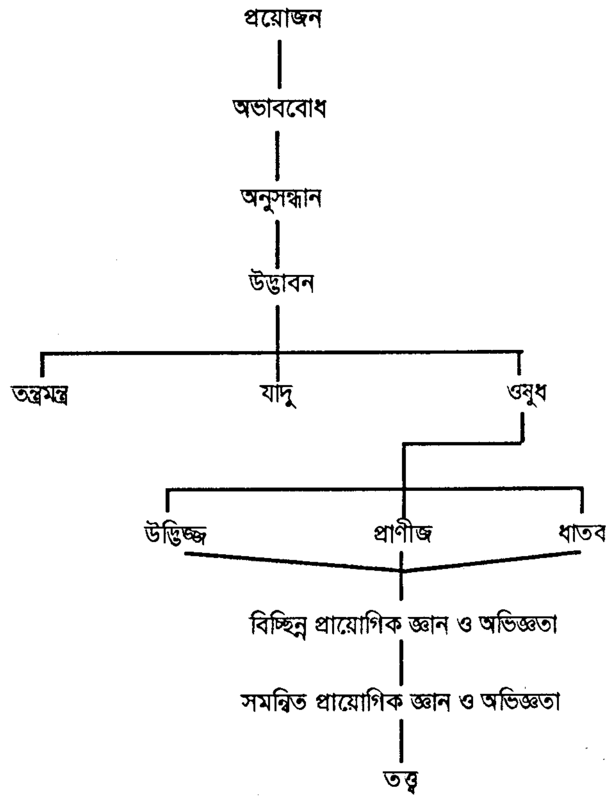

রোগ এবং চিকিৎসা প্রাণিজগতের সহজাত। কুকুর ও বিড়ালকে পেটের ব্যামো সারাতে ঘাস খেয়ে বমি করতে দেখা যায়। মানুষ যেমন আহত অংগে মুখের লালা মাখে তেমনি পশুরা জিভ দিয়ে তাদের দেহের ক্ষত লেহন করে। লোকে বলে, নেউলে কি যেনো ভেষজ গায়ে মেখে শক্তিধর সাপকে পরাভূত করে। রোগ–রাজ্য ঘিরে অনন্ত রহস্য, সর্বকালেই ছিলো, এখনো আছে। জিন ভূত, পেত্নী, দৈত্য, কাল প্রভৃতি অপদেবতার 'দৃষ্টি', 'নজর', 'আছর' ইত্যাদি বিষয়ে লোকবিশ্বাস অবিচল। সেজন্যে মন্ত্র, তাবিজ, কবচ, ঝাড়ফুঁক, পাদোদক, মানত, পূজা, অর্চনা, পীর–সন্যাসীর কাছে ধরনা। সেসাথে চলে ওষুধের অনুসন্ধান ও প্রয়োগ।

এদেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের লিপিবদ্ধ কোনো ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। উদ্ভাবিত ভেষজের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যাঁরা সফল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের প্রয়োগ

কৌশল সঙ্গোপনে রেখেছিলেন যাতে উত্তরসুরি একে ব্যবসার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারে সক্ষম হয়। এঁদেরকে আয়ুর্বেদ বা কবিরাজ বলা হয়। কোথাও কোথাও কবরেজদেরকেও ঝাড়ফুঁক বিশারদদের মতো গুণীন বলা হয়ে থাকে।

পৃথিবীতে চিকিৎসা-সাহিত্যের সন্ধান মিলে চীনে, খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে। ব্যাবিলনীয় সমৃদ্ধ চিকিৎসা শাস্ত্রের বয়স খ্রিষ্টপূর্ব দু' হাজার বছর। খ্রিষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে ঋগ্বেদে বলা আছে-সাপের বিষ মানুষকে দীর্ঘায়ু দান করতে পারে। ঋগ্বেদই রোগ ও ওষুধ বিষয়ক অনেক তথ্য সরবরাহ করে। তাও প্রণালীবদ্ধ নয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০ বছর আগে প্রণালীবদ্ধ চিকিৎসাশাস্ত্রের অস্তিত্ব দেখা যায়। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, এসব গ্রন্থে লোকচিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রয়োগ বিধি ও ভেষজের গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে। এ শাস্ত্রকে আয়ুর্বেদ বলা হলেও তখনকার সমাজপতিরা এর প্রণেতাদের মহর্ষি বলতে দ্বিধা করেছে। যেমন চরককে মহর্ষি মর্যাদা তখন দেয়া হয় নি। কিন্তু অন্যান্য বেদজ্ঞরা অনায়াসে মহর্ষি শিরোপা লাভ করেছেন। মনু সংহিতার বিধান ছিলো ব্রাহ্মণ চিকিৎসা-বৃত্তি অবলম্বন করলে তিনি অপাংক্তেয়, অস্পৃশ্য বিবেচিত হবেন এবং স্বধর্মচ্যুত হবেন।

এসময়কালে শল্য চিকিৎসার কিছু বিকাশ ঘটেছিলো। আর এ বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন নরসুন্দর গোষ্ঠী। ক্রিশ্চিয়ান বার্নাড নরসুন্দরদের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার নন নিশ্চয়ই। এককালে যা ঘৃণ্য কাজ বলে নিন্দিত হতো, পরবর্তীকালে তা নন্দনযোগ্য কাজ বলেই ভদ্রলোকরা সে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এসময় শরীরবিদ্যায় জ্ঞানের অভাব ছিলো প্রচুর। অংগসংস্থান বিদ্যার প্রশ্নই আসে না।

খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে হিপোক্রাটিস অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার প্রবর্তন করেন। বাহুল্য বলা যে, অ্যালোপ্যাথি আধুনিককালে সম্ভূত ও নিরেট বিজ্ঞানসম্মত বলে যে কৌলিন্য দাবি করে তার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এটিও লোকচিকিৎসার অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত, তথাকথিত সেকেলে চিকিৎসার সংস্কৃত ও পরিশীলিত রূপ। এ শাস্ত্রকেও ভুলের অনেক চড়াই-উতরাই পার হতে হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম আমলে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিকাশ ঘটে। সর্বপ্রথম এখানে একটা ধর্মনিরপেক্ষ চিকিৎসা চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বিভিন্ন ধর্মের ও দেশের বিজ্ঞানী গবেষক ও চিকিৎসক সেখানে গবেষণা ও চিকিৎসা করেন। বিভিন্ন গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়।

ধর্মশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় প্রথম দিকে ধর্মযাজকরা মনে করতেন চিকিৎসা দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শাস্তি বিধানের অন্তরায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সে জন্যে চিকিৎসকের দণ্ড ছিলো নির্মম। মনু সংহিতার বিধানের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা

হয়েছে। সম্ভবত এ কারণে আয়ুর্বেদে কোনো কোনো রোগকে ব্রাহ্মণের অভিশাপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গৌতম মুনির প্রিয়তম শিষ্য দেবরাজ ইন্দ্র মুনির ছদ্মবেশে রূপসী গুরুপত্নীকে সম্ভোগের অপরাধে অভিশপ্ত হন। গৌতমের অভিশাপের ফলে তাঁর গায়ে অসংখ্য ভগের সৃষ্টি হয়। যে রোগকে আধুনিকের পরিভাষায় সম্ভবত কুষ্ঠ বলা যেতে পারে। আয়ুর্বেদীয়রা শান্তি–স্বস্ত্যয়ন, গ্রহপূজা ও দেবতুষ্টির বিধানকেও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন বা তাঁদের মজ্জাগত সংস্কার তা মেনে নিতে তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে। পাশ্চাত্যে হিপোক্রাটিস চিকিৎসাশাস্ত্রকে প্রথম যাজকতন্ত্রের প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি প্রচার করেছিলেন, প্রকৃতির অসংখ্য কাজের মধ্যে রোগও একরকম কাজ। এরপরও যাজকতন্ত্র ফণা মেলে থাকে। যেমন ইরিসেপালাস বা বিসর্গ রোগের নামকরণ করা হয়েছিলো Saint Antony's Fire বা সাধু এন্থনীর অভিশাপ। কিন্তু ধীরে ধীরে চিকিৎসাশাস্ত্র জনগণের কাছে নন্দিত হয়ে উঠলে চিকিৎসা–বিরোধী যাজকরাই চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করতে থাকে। আরো পরে এই যাজক চিকিৎসকরাই রাজ চিকিৎসকের পদ অলংকৃত করেন। লোকায়ত চিকিৎসাশাস্ত্র আমলাতন্ত্রের অধীন হতে থাকে। মজার কথা, আবার এই চিকিৎসকরাই যা ফতোয়া দিতো তার বিরোধিতা সহ্য করা হতো না। বিরোধীরা পেতো নির্মম শাস্তি।

মানুষের গায়ের হাড় কুকুরের মতো বাঁকা নয়, সোজা। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে পুরুষের বাম পাঁজরের একটা হাড় কম নয় (যে হাড়টি দিয়ে ইভকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো) এই কথা বলার অপরাধে শারীরস্থানবিদ প্রফেসর ভ্যাসেলিয়াস ক্ষমা ভিক্ষা করেও পরিত্রাণ পান নি। তিনি নিন্দিত হন চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, এমনকি তাঁর শিক্ষক ও ছাত্র দ্বারা। সেই ছাত্রটি হলেন আমেরিকা আবিষ্কারক কলম্বাস। যদিও অনেকেই জানতেন ভ্যাসেলিয়াস মিথ্যা বলেন নি। কিন্তু গ্রীক সম্রাটের চিকিৎসক গ্যালেনের তত্ত্বের বিরোধিতা করা আইনত অপরাধ। গ্যালেন বলেছিলেন মানুষের গায়ের হাড় কুকুরের মতো বাঁকা। ষোড়শ শতকের কথা বলছি। এই শতকেই গ্যালেন তত্ত্বের বিরোধিতা করার জন্য প্রখ্যাত চিকিৎসক প্যারাসেলসাসকে সুদূর দ্বীপাঞ্চলে নির্বাসনে যেতে হয়।

খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পাশ্চাত্যে হিপোক্রাটিস ও মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম চিন্তাবিদরা চিকিৎসাবিদ্যাকে সুষ্ঠু পরিণতিদানের জন্যে যে কাজ শুরু করেছিলেন তা প্রধানত উল্লিখিত কারণে বাধাগ্রস্ত হয়। পূর্বে যা টোটকা চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিলো তা পরম হিতকর ও আরোগ্যকারী না হলেও উপশমদায়ী ছিলো। কিন্তু যাজক–চিকিৎসকদের যুগে শুরু হয়েছিলো অন্য ধরনের কাণ্ড–কারখানা। চিকিৎসা তখন ছিলো যুক্তিবর্জিত

স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত। দেহে অনিষ্টকর বহির্বস্তুর অনুপ্রবেশকে রোগের কারণ বলা হতো। শরীরে প্রদাহের কারণ রক্তাধিক্য, মহামারীর কারণ পচা বাষ্প ইত্যাদি। এসবের চিকিৎসা বমন, বিরেচন, ঘাম, লালা, শ্লেষ্মা ও মূত্র নিঃসরণ, রক্তমোক্ষণ। ধনী-দরিদ্র প্রতিভাবান ব্যক্তি আর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত এসবের শিকার হন। অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় কাইজার লিওপোল্ড দীর্ঘকাল পেটের ব্যমোয় ভুগেন। এই অবস্থায় জ্বরের জন্য চব্বিশ ঘন্টায় চার বার রক্তমোক্ষণের পর তাঁর মৃত্যু ঘটে। রাজা ত্রয়োদশ লুইয়ের এক বছরে ৪৭ বার রক্তমোক্ষণ, ২১৫ বার জোলাপ ভক্ষণ, ২১২ বার মলভাণ্ড পরিষ্কারের জন্য পিচকারী ব্যবহার করা হয়। ফলে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হয়। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত কবি বায়রন, টনসিল প্রদাহে আক্রান্ত প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন বার বার রক্তমোক্ষণের ফলে মারা যান। এ সময়কালে প্যারিসের হাসপাতালসমূহে মানুষের হাজার হাজার পাউণ্ড রক্ত বের করা হতো। সেসময় রোগ ও চিকিৎসা দুটোই মানুষের কাছে সমান ভীতিপ্রদ ছিলো। শিরা কেটে সরাসরি রক্তমোক্ষণ ছাড়াও প্রত্যেক চিকিৎসক জোঁকের সাহায্যে রক্তমোক্ষণ করাতেন। চিকিৎসকের ঝুলিতে শিশির মধ্যে জোঁক থাকতো। এখন যেমন থাকে স্টেথিসকোপ ও রক্তচাপমাপক যন্ত্র। জোঁকের ইংরেজি নাম লিচ। লিচ অর্থ চিকিৎসক। জোঁক চিকিৎসক।

এমনকি উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চিকিৎসার নামে প্রচলিত ছিলো লালা, ঘাম, কফ নিঃসারণ, জোলাপের পর জোলাপ দিয়ে দাস্ত করানো, বমি করানো, প্রস্রাব করানো, গুল বসিয়ে শরীরের তাজা মাংস পচিয়ে বিষাক্ত জিনিস বের করা, গরম-ঝর্ণার জলে স্নান, শিরা কেটে বা দেহে অসংখ্য জোঁক লাগিয়ে রক্তমোক্ষণ, অমরত্ব লাভের বাসনায় সঞ্জীবনী **(Elixir of life)** অনুসন্ধানে অজানা বিষপান করানো এমনি আরো কতো কি।

ওষুধের গুণাগুণ নিরূপণের নির্দিষ্ট কোনো মান ছিলো না। যথেষ্ট কুসংস্কারও ছিলো এর সংগে। কোনো গাছের রস লাল, তাহলে তা রক্তের উপর কার্যকর। হৃদপিণ্ডের মতো দেখতে কোনো পাতাকে হৃদপিণ্ডের ওষুধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এন্টিমনি খেয়ে বেশ কিছু শূকর মারা যায়। কিন্তু কিছু শূকর বেশ পুষ্ট হয়। এন্টিমনিই হাড় জিরজিরে মানুষের দাওয়াই। পেটের রোগ সারার জন্য আকন্দ গাছের আঠা দিয়ে বা কোনো বিদাহী ওষুধ দিয়ে পেটের উপর ফোসকা তোলা, যকৃৎ স্ফীতিতে পোর্টাল ভেইনকে জ্বলন্ত লোহা দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া। তাছাড়া অনির্ণেয় জটিল রোগে নুন-ঝাল-টক-মিষ্টি-তেতো-কষা স্বাদযুক্ত ও গুণযুক্ত বহু ওষুধের মিশ্রণ। আবার একটি রোগীর ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গে ভিন্ন ভিন্ন ওষুধের ব্যবস্থা ছিলো।

রোগের কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দূষিত বা বিষাক্ত বাষ্পকে গণ্য করা হতো। অজ পাড়াগাঁয়ে এখনো কারো বিশেষ করে মস্তিষ্ক-বিকৃতি, মৃগী ও আক্ষেপের রোগীকে 'গায়ে বাতাস লেগেছে' বলে লোকবিশ্বাস সুপ্রচলিত। সিনকোনো আবিষ্কারের আগে ম্যালেরিয়া রোগের জন্য দূষিত বায়ুকে দায়ী করা হতো। ম্যালেরিয়া শব্দের অর্থ খারাপ বায়ু। চিকিৎসার মূল লক্ষ্য ছিলো ময়লা নিষ্কাশন। রোগ দ্বারা দেহ আক্রান্ত হবার পূর্বশর্ত হিসেবে বায়ু-পিত্ত-কফের বিকৃতিকে দায়ী করা হতো। এখনো আয়ুর্বেদীয়রা এ বিশ্বাসে অটুট আছেন। দেহে রস কমা বাড়াকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে ওষুধের প্রয়োজন বলে সিদ্ধান্ত ছিলো। উল্লেখ্য, আয়ুর্বেদী লোক-চিকিৎসকদের অনন্য কৃতিত্ব হলো নিঃসাড় (inert) বস্তু থেকেও মর্দন বা বিচূর্ণন পদ্ধতিতে এর কার্যকারিতা বিকাশের উপায় উদ্ভাবন। পরবর্তীকালে উন্নততর চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকাশে এ চূর্ণন বা trituration পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Succussion, stirring ইত্যাদির মাধ্যমে ওষুধ-শক্তিকে জাগ্রত করার কৌশল এখানেই সংগুপ্ত ছিলো। আমি উল্লিখিত রোগ-চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবক ও প্রয়োগকারীদের সম্পর্কে নিন্দাবাদ প্রকাশে উৎসাহী নই। কারণ প্রাথমিক স্তরে এমন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অকাণ্ড-কুকাণ্ড হতে বাধ্য। স্বীকৃত, বিজ্ঞাননিষ্ঠ কোনো স্থির অভিজ্ঞান দিকদর্শন হিসেবে না থাকলে এমনটি ঘটা বিচিত্র নয়। তাদের প্রয়াস নিঃসন্দেহে শুভবুদ্ধি প্রণোদিত ছিলো। লক্ষ্য ছিলো মানুষের রোগমুক্তি। যদিও তা কখনো আরোগ্য আনতে পারতো না, পারতো শুধু যন্ত্রণার উপশম দিতে।

সুদীর্ঘকাল ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ও ভুল-ত্রুটির মাধ্যমে হলেও লোক-চিকিৎসকরা অনেক বিস্ময়কর উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন। বিচূর্ণন পদ্ধতির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা বাঁশের সবুজ ত্বক চেঁছে ক্ষতস্থানে বেঁধে রক্তপাত রোধ করেছেন। একই উদ্দেশ্যে কচুপাতার রস, ঘরের ঝুল, তুষের পোড়া ছাই, দুর্বা ঘাসের রস, আসামী পাতা ও গেঁদা পাতার রসকে কাজে লাগিয়েছেন। জোঁকে কাটলে ন্যাকড়া পোড়া কালো ছাই ব্যবহার সফল প্রমাণ করেছেন। আঘাতে ও বাতের বেদনায় জয়ন্তী গাছের পাতা, মেচুয়া পাতা বা সজনের ছাল বাটার প্রলেপ, কোষ্টবদ্ধে তেঁতুল পাতার ঝোল, ঈসপগুলের ভূষি, বেলের সরবত, আমাশয়ে কচি আম বা জাম পাতার রস, থানকুনি পাতার বা রসগোল্লার রস, জ্বরে প্রথমে তেতো আহার, সূতাকৃমির জন্যে নারকেলের দুধ, প্রদাহে চুনের প্রলেপ, ফোঁড়া-আঁচিল-টিউমার-অর্শের বলী ও হাত-পায়ের কড়ের চিকিৎসায় চুনসহযোগে কলাগাছের খোসা পোড়া ছাই বা আকন্দের আঠার প্রলেপ বা চুন-সোডার মিশ্রণ, চোখের ছানি

রোগে টিকটিকির মল, মানুষ বা পশুপাখির উকুণে আতা পাতার রস মাখানো, পেট ব্যাথায় সর্ষের তেল মর্দন, অজগর বা রুইয়ের পিত্ত, সর্দিকাশে পুরনো ঘি, স্বপ্নদোষে ঘৃতকাঞ্চনের মজ্জা ইত্যাদি সফলভাবে ব্যবহার করেছেন। রোগের উৎপত্তি ও লোক–চিকিৎসা সম্বন্ধে লোকবিশ্বাস সারা পৃথিবীতে প্রায় একই রকম বলে জানা যায়। সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে সমাজে মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি বিষয়ক ধ্যান–ধারণাও গড়ে ওঠে। পৃথিবীর কোনো দেশের মানুষ কোনো যুগে যে সামাজিক অবস্থানে ছিলো, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের মানুষকেও যে কোনো যুগে সে অবস্থানে থাকতে হয়েছে। বাংলাদেশে অদ্যাবধি প্রাপ্ত রোগ–উৎস ও রোগ চিকিৎসা–বিষয়ক লোকউপাদান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এতে বিজ্ঞাননিষ্ঠ কারণের সাক্ষাৎ মিলে খুব কম। প্রায় সমস্ত চিন্তা–ভাবনা জুড়ে রয়েছে এক ধরনের বিশ্বাস যার কোনো সঠিক ভিত্তি ও ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। যেমন বলা হচ্ছে– মায়ের স্তন চুলকাইলে ছেলের অসুখ হয়, সন্ধ্যার সময় কুত্তা কাঁনলে কলেরা আসে। রাইতে কান খাউজাইলে মানুষ ধোন্দা হয়। আঁছিলা মাইরলে গায়ের মৈঙ্গদে আঁচিলা হয়, চালুন মাথায় নিলে মাথায় পাঁচড়া হয়, রাস্তায় পইরা তাহা হাড় পাড়াইলে গায়ে ঘাও হয়, মেয়েদের কাপড়ের আঁচল দিয়া পুরুষের মুখ মুছিলে মুখে একপ্রকার ফোঁড়া হয়, কলা গাছে চুন পুছলে আলা জিহ্বা পচিয়া যায়, গলসত পানি থাকতে আবার পানি গলসত ভরিলে পেটের অসুখ হয়। চাইল ঝারবার সমে পাদ দিলে বাওসী (আমাশয়) হয়। সাদা উডান ঝাড়ু দিলে আদ মাতার ব্যারাম হয়। বাবামার বদ দোয়ায় যক্ষা ব্যারাম হয়। মামা যদি ভাইগনাকে মারে হাত লুলা হইয়া যায়। মুড়া ঝাড়ু দিয়া কাহার গায়ে পিটান দিলে সে শুকাইয়া যায়। তামুক চুরি কইল্লে আহি (হাঁপানি) অয়। কুলার বাতাস গায়ে লাগিলে 'পিছাইয়া' (রোগশোক) ছাড়ে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

কালেভদ্রে রোগের প্রায় বিজ্ঞানসিদ্ধ যে সব কারণ পাওয়া যায় তার নমুনা এরকম : বাতের ব্যারাম আলা মাইনষের চুল পাহে তাড়াতাড়ি। জোরে আঁইস (হাসি) দিলে হৃৎপিণ্ড বেরাম হয়। পাঁকা পুটি আম বেশি খাইলে শরীর হুকাইয়া যায়। না খাওয়ার অভ্যেস কৈল্লে প্যাটের আঁত হুকাইয়া যায়। বিলাইর লোম পেটে গেলে ক্ষয়কাশ হয়। ভাত খাইতে বই বেশি কথা কইলে আধমাথা ব্যথ ধরে। যে মানুষে কাঁচা আণ্ডা বেশি খায় তার বাতের ব্যারাম হয়। ফাগুন মাসে আনাজ (সীম) খালি বসন্ত হয়। পোড়া মইচ খাইলে মাইনষের ক্রিমি হয়। মুড়ি খাইয়া পানি খাইলে পেট নষ্ট হয়। ইচা মাছ বেশি খাইলে আমাশা ব্যারাম হয়। বাসি প্যাটে গরম পানি বাত

খাইলে পিত্ত নষ্ট হয়। গন্যার সময় (গ্রহণ) কোন কিছু খাইলে অজম হয় না। ফাল্গুন-চৈত মাসে বাইগোন খাইলে শইলো খাউচ পচারি অয়। অমাবস্যা পূর্ণিমার রাইতে গাও-গতরে রসের ভার হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। বিজ্ঞানের বিচারে এসব কথার মধ্যে কিছু কিছু সত্যের আভাস পাওয়া যায়। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে কতগুলো অভিজ্ঞতার সাথে মানুষের বারবার পরিচয় ঘটে। সেসব অভিজ্ঞতা থেকে এ ধরনের বক্তব্য এসে থাকতে পারে। তবে বিড়ালের লোম পেটে গেলে যক্ষ্মা হয় কি-না তা আধুনিক বিজ্ঞানেরও জানা নেই। এ ধরনের ক্ষেত্রে হয়তো গবেষণার প্রয়োজন আছে।

রোগের উৎস সম্বন্ধে হয়তো আরো বিস্তর লোকউপাদান রয়েছে, যা আজো সংগ্রহের অপেক্ষায়। এখন চিকিৎসা বিষয়টি দেখা যাক। চিকিৎসাক্ষেত্রে তৎকালে উদ্ভিদ ভেষজের ওপরই সঙ্গতভাবে নির্ভরশীলতা দেখা যায়। যেমন হাঁপানিতে মান কচুর পাতার রস, টাকে পেঁয়াজ ঘষা, খুশকিতে মশুর, খৈল, ডিম, আগুনে পোড়ায় আলু বাটা বা কাঁচা ডিম, আলজিভের ব্যথায় মধু ও তুলসী পাতার রস, ফোঁড়ায় তোকমা, ক্ষয়রোগে উটের পেচ্ছাব, পা-ফাটায় আম-কাঁঠালের আঠা, জিভের ঘায়ে কলাপাতার শিশির চাটা, বাতে রসুন, পাঁচড়ায় নিমপাতা, মাথাঘোরায় ঘৃতকাঞ্চন; গোদে কদম্বের পাতা, দাঁতের ব্যথায় নিশিন্দার পাতা, পেটের ব্যথার পুকুরের পাঁক পেটে লাগানো, আমাশয়ে আমরুলের পাতা, বেল পোড়া, রোদ লাগায় তেঁতুল গোলা পানি, কানের পুঁজে রসুনসহ গরম সরিষার তেল ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব প্রেসক্রিপশান প্রাথমিক পর্যায়ের জন্যে হয়তো সুফলদায়ক। পরবর্তীতে বা জটিল অবস্থায় কী ব্যবস্থা তার বিষয়ে সংগৃহীত লোকউপাদানে কোনো উপাত্ত নেই।

লোকচিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগ-উৎস ও নিরাময় ব্যবস্থার চাইতে লোক-স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক ফরমায়েশ ও উপদেশই বেশি। এবং এসব যথার্থও বটে। বলতে গেলে মানুষ এক্ষেত্রেই তার অভিজ্ঞতার সার-সংক্ষেপ করতে পেরেছে বেশি। ভেষজ সম্পর্কে মানুষ তৎকালে ওয়াকেবহাল হলেও তার সম্যক পরিচয় লাভের জন্যে যে লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োজন তা সেকালে কল্পনারও অতীত ছিলো। ওষুধ প্রয়োগের ব্যাপারেও সমস্যা ছিলো একই রকম, বরং আরো বেশি। স্বাস্থ্যবিধান বিষয়ে কিছু নমুনা যেমন ঃ আমে ভোগ কাঁঠালে রোগ, গতরের নাম পরশমণি, গোপন চিজ শরীলের বিনাশ, গোসলে অধিক সুখ তৈল দিলে গায়, জান ছেলামত হাজার নেয়ামত, তাল, তেঁতুল, কুল তিনে বস্তু নির্মূল, দাঁত গেল ত জাঁত গেল, বিনা খাটুনি ভাত খায়-শরীরে করে উৎপাত, মানুষের তেলে-জলেই শরীর, যদি না ছাড়ে পথ্যে কি করিবে বৈদ্যে, রাত

উপাসে হাতিও পড়ে, রোগ মুড়িতে আর ভুঁড়িতে ইত্যাদি। লোকচিকিৎসা মা, শিশু ও গর্ভবতী বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় চমৎকার বক্তব্য রেখেছে যদিও তাতে বিজ্ঞানের চেয়ে বিশ্বাসের আধিক্যই বেশি। বাহুল্যবোধে তা উল্লেখ করা হলো না।

এবার যাদুর প্রসঙ্গে আসা যাক। যাদু বিষয়ে নানা জনে নানা মত। কেউ বলেন যাদুর সাথে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। কেউ বলেন যাদু অপবিজ্ঞান। আবার কারো মতে, যাদু বিজ্ঞানের কিছু কিছু দায়িত্ব পূরণের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। আপনারা জানেন, অভিধান অনুযায়ী যাদুবিদ্যা হলো অতিপ্রাকৃতকে অধিগত করার এবং সে সঙ্গে অতিপ্রাকৃত উপায়ে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার (The art of compulsion of the supernatural : also the art of controlling nature by supernatural means).

লোকবিজ্ঞানী স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার বলেন, 'সংক্ষেপে যাদুবিদ্যা হলো প্রাকৃতিক বিধানের ক্রটিপূর্ণ পদ্ধতি, সে সঙ্গে তা আচার-আচরণের ক্ষেত্রে কৃত্রিম পথনির্দেশক। এটি ভুয়া বিজ্ঞান ও সেই সঙ্গে একটি মৃতবৎ শিল্পকর্ম (In short magic is a spurious system of natural law as a fallacious guide of conduct, it is a false science as well as an abortive art).

লোকবিজ্ঞানী টাইলারও এ মতের সমর্থক। মেলিনোওস্কির মতে, যাদুবিদ্যা মেকী বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান কোনটাই নয়। তাঁর মতে, আদিম মানুষ বিজ্ঞান ও যাদুবিদ্যাকে পাশাপাশি অবিকৃত রেখেও উভয়কেই নিজেদের কাজে লাগিয়েছে। যা মানুষের কাজে লাগে তা-ই তার কাছে গ্রাহ্য ও বরণীয়। বিজ্ঞানের সাধনাও মানুষের কাছে সমাদরলাভ।

ঝাড়, ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্রের ভূমিকাও যাদুবিদ্যার মতো। মানুষের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারলে তা তার মনোবল বাড়ায়। মনোবল বাড়লে সে মানুষ অপ্রতিরোধ্যকে প্রতিরোধ, অজেয়কে জয়, দুরারোগ্যকে আরোগ্য করে তুলতে পারে। যাদু, তন্ত্রমন্ত্র সবই সম্মোহনের গোত্রভুক্ত। যাদুকর মানুষকে বিমোহিত, বিমূঢ় বা সম্মোহিত করার ক্ষমতা ধারণ করেন বলেই তিনি নানান কাণ্ড চোখের সামনে ঘটাতে পারেন। চিকিৎসা তো কেবলমাত্র ওষুধ দিয়ে হয় না। চিকিৎসকের ব্যক্তিত্ব, বাচনভঙ্গি, দেহসৌষ্ঠব, আচার-আচরণ, হাসি, চোখের চাহনি, স্পর্শ করার ধরন, বিষয় বস্তুর উপস্থাপনা, চিকিৎসকের পরিবেশ সবকিছুই রোগীতে প্রতিক্রিয়া করে। ওষুধের বিকল্প হিসেবে যা কাজ করে সব তো সম্মোহনের পর্যায়ে পড়ে। বিশ্বাসের পর্যায়ে পড়ে। একেক চিকিৎসক একেকজনের জন্যে ধন্বন্তরী। তাঁর উপস্থিতিতেই রোগ অর্ধেক সেরে

যায়। তবে প্রশ্ন হলো, আমাদের আয়ত্তে যখন আধুনিক যুগের সুযোগ–সুবিধা রয়েছে তখন ঝাড়–ফুঁক, যাদু বা তাবিজ কবচে কালক্ষেপের প্রয়োজন কি ? অতীতের অভিজ্ঞতায় এসবের আংশিক সফলতাই প্রমাণিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসবের ব্যর্থতা সর্বনাশ ডেকে এনেছে। কাজেই সম্ভাব্য স্থলে এসবের সাহায্য না নেয়াই ভালো। আমি বিষয়টিকে একেবারে নস্যাৎ করে দিতে ভরসা পাই না। এ কারণে যে, ঝাড় ফুঁকওয়ালারা যে আত্মবিশ্বাস মানুষের মধ্যে আগে প্রবলভাবে জাগরুক রাখতে পেরেছে, আধুনিক চিকিৎসকরা তার বিকল্প দিতে পারেন নি। মানুষ যে পরিবেশে জন্ম নেয়, সে চতুষ্পার্শ্বের সে পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। আজন্মলালিত সংস্কার উপযুক্ত সহায়ক পরিবেশ না পেলে উবে যায় না। এ জন্যে পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র ঢাকেশ্বরী কালীবাড়ির প্রসাদ নিয়ে কার্জন হলে পরীক্ষা দিতে যায়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ তুখোড় ছাত্র দোয়া দরুদ বিশ্বাস করে, অসংখ্য ডাক্তার, নার্স ছাত্রের বাহু বা গলায় থাকে তাবিজ। তাঁদের ছেলে–মেয়ে–স্ত্রীর ওপর জরিপ চালান, সেখানেও দেখবেন একই অবস্থা। আমি এসবের বন্দনা করছি না। বাস্তব অবস্থা বোঝানোর জন্যে এ কথা বলছি।

আরোগ্য অর্থ হলো restore to health. পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেয়া। কাকে ? রুগ্ন মানুষকে। ওষুধ হলো কৃত্রিম রোগ। প্রাকৃতিক রোগের মোকাবেলায় কৃত্রিম রোগের প্রয়োগ। চিকিৎসা হলো healing art বা আরোগ্যকলা। চিকিৎসক আরোগ্য কলা যেভাবে প্রয়োগ করলে রোগী উপশম পায়, আরোগ্য হয়, তাতেই তাঁর সার্থকতা। এ ক্ষেত্রে তাঁকে কৌশল উদ্ভাবন করতে হয়, যা তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্কলন। এই কৌশল যে চিকিৎসক যতো সার্থকভাবে প্রয়োগে সিদ্ধ তিনি ততো বেশি সফল। এই সাফল্য অর্জনের স্বার্থে চিকিৎসককে অন্ধবিশ্বাসী ও গোঁড়া হলে চলে না। তাঁকে বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে বাস্তব সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কারণ তাঁকে মানবজীবনের মতো জটিল রহস্যঘন বিষয় নিয়ে অহর্নিশ কাটাতে হয়। তাঁর একগুঁয়েমি একটি জীবনের যবনিকা টানতে পারে। কাজেই আজকের চিকিৎসাবিজ্ঞানকে অতীতের যাবতীয় ভালো জিনিসের সার গ্রহণ ও আত্তীকরণের নিরন্তর প্রয়াস চালাতে হবে। আমাদের অনেক সমৃদ্ধ অতীত আছে যা আজো উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। লোকচিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা এদেশে এখনো গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি।

বার্ধক্য প্রহেলিকা

শিশু ধীরে ধীরে বড় হয়ে কিশোর হয়। কিশোর দ্রুত যুবায় পরিণত হয়। যৌবনের স্থায়িত্ব একটু দীর্ঘ। যৌবনের পরপরই প্রৌঢ়ত্ব। প্রৌঢ়ত্বের ভিতরেই বার্ধক্য উঁকিঝুঁকি দেয়। কারো ক্ষেত্রে দ্রুত, কারো ক্ষেত্রে একটু দেরিতে। বার্ধক্য এসেছে টের পেলে মানুষ মুষড়ে পড়ে। মনে করে জীবনের ইতি বোধ করি আসন্ন। প্রত্যেক জীবেরই একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমা আছে। বার্ধক্য দেহের স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতি–এ কথা মেনে নিতে অনেকেরই কষ্ট হয়। অনেকের মনে বার্ধক্য বিষয়ে ভীতি ও শংকা জেগে উঠে। এ কারণে বার্ধক্যকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য এবং অবধারিত বার্ধক্যকে প্রলম্বিত করার সাধনা চলেছে শত শত বছর ধরে। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার শুরুও প্রায় শত বছর ধরে।

বিবর্তনের ইতিহাস দৃষ্টে বলা যায় যে, সকল প্রজাতির জীব একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বাঁচে। মানুষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান মানবশিশুর অকালমৃত্যুর হার অনেকটা কমিয়ে এনেছে এবং মানবদেহে সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ ও তজ্জনিত ব্যাপক মৃত্যুহার ঠেকিয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য বেশিদিন ধুঁকে ধুঁকে বাঁচা নয়। সুস্থ, কর্মক্ষম দেহকে দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখা। একটি মানুষ একশ বছর পর্যন্ত কর্মক্ষম দেহ টিকিয়ে রাখতে পারে। বিজ্ঞানের লক্ষ্য এই বয়সসীমা ১১০–১২০ পর্যন্ত বাড়ানো।

বার্ধক্যরোধ ও বার্ধক্য দীর্ঘস্থায়ী করার ব্যাপারে জীববিজ্ঞান অতীতের গবেষণাসমূহকে সংকলিত করে পরীক্ষা করে দেখছে। প্রাচীন চৈনিক রসায়নবিদগণও বৈদিক জনসাধারণ এবং সম্প্রতিকালের আরবীয় চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা ও ইউরোপীয় জৈবরসায়নবিদরা মানুষের সীমাবদ্ধ বয়সসীমার ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এ সকল গবেষণা–উপাত্ত আধুনিক গবেষকদের দিক–নির্দেশক হিসেবে কাজ করছে।

সকল ধরনের দৃষ্টিকোণ থেকে বার্ধক্যের সমস্যাকে বিবেচনা করা হচ্ছে। বার্ধক্য–গবেষক বা বার্ধক্য–বিজ্ঞানীরা সাধারণত তিনটি ক্ষেত্র থেকে আসেন। এর একটি

হলো সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানীদের প্রয়াস হলো অবসরপ্রাপ্ত মানুষের কল্যাণসাধন। দ্বিতীয় ক্ষেত্র হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা অকাল বার্ধক্য, সর্দিপ্রদাহ, বাত, বৃক্ক ও হৃৎপিণ্ড-এর ব্যাধি, ক্যানসার এবং এ সবের প্রতিরোধ ও উপশম বিষয়ে কাজ করায় উৎসাহবোধ করেন। তৃতীয় ক্ষেত্রে জীববিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, জীবরসায়নবিদ, পদার্থবিদ প্রমুখরা প্রাপ্তবয়স্ক মানবদেহে কোষের শারীরবিদ্যগত, জীবরসায়নগত ও আণবিক পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করেন এবং বার্ধক্য-সৃজনের গতি কমিয়ে আনার জন্য গবেষণায় রত থাকেন।

আমাদের মতো দরিদ্র দেশে বার্ধক্য বিষয়ক গবেষণা একটু কষ্টকর বৈকি। এখানে অসম সামাজিক অবস্থায় কেউ বেশ বিত্তবান, আবার পাশাপাশি কেউ অতি দরিদ্র। কারো খাদ্যে পুষ্টিমান প্রয়োজনের অতিরিক্ত, কারো খাদ্যে পুষ্টিমান প্রয়োজনের তুলনায় একেবারে কম। ফলে কেউ অতিপুষ্টি, কেউ অপুষ্টিতে ভুগছে। সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশ নিজেরা পর্যাপ্ত খাবার তো খায়ই সেসঙ্গে অপচয়ও করে। অথচ অধিকাংশ মানুষ দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। নগরে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া পচাবাসী খাবার খেয়েও দিন কাটে অনেকের। অঞ্চলভেদে তাপমাত্রার হেরফের, উঠানামা তো রয়েছেই। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার হেরফের দেহের উপর প্রভাব ফেলে। এদেশের কেউ কেউ চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতায় রকেট যুগের আবহে দিন কাটিয়ে আরো উন্নত প্রযুক্তির একবিংশ শতাব্দীকে স্বাগত জানাচ্ছে। অথচ দেশের শতকরা ৮০-৯০ ভাগ মানুষের চিন্তারথের চাকা গেঁথে আছে অশিক্ষা, কুসংস্কার ও সেকেলে চিন্তার আঠালো কাদায়। এখানে কালের ঘড়ির কাঁটা থেমে আছে। এরা একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় এসেও উনবিংশ শতাব্দীর অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। এরকম বিচিত্র সামাজিক পরিবেশে বার্ধক্য নিয়ে গবেষণার সম্ভাবনা ও পরিধি বিস্তৃত বটে কিন্তু এ বিষয়ে উপসংহারে আসা বেশ অসুবিধাজনক।

সাদা চোখে আমরা সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের মতো ভুখা-নাঙার দেশেও বুড়োদের সংখ্যা বাড়ছে। এর কারণ এই নয় যে, মানুষের খাদ্যে পুষ্টিমান বেড়েছে, মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রকৃত কারণ সম্ভবত দুটো। একটি হলো সংক্রামক ব্যাধি বর্তমানে অধিক হারে নিয়ন্ত্রিত। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই বিজয় প্রবীণ ও বৃদ্ধদেরকে হঠাৎ অসময়ে ঝরে পড়ার হাত থেকে বাঁচাচ্ছে। একজন কিশোর বা যুবক সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণকে যেভাবে প্রতিরোধ করতে পারে তেমনি পারে না হাড় ঝিরঝিরে অপুষ্টির শিকার একটি প্রবীণ বা বৃদ্ধ মানুষের দেহ।

ফলে সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ হলে পূর্বে শীতে উদ্ভিদের পাতা ঝরার মতো কাতারে কাতারে বৃদ্ধরা মৃত্যুর শীতল কোলে আত্মসমর্পণ করতো। এখন সেসব ভয়ংকর দিনের অবসান ঘটিয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞান। বসন্ত, হাম, ডায়রিয়া, কলেরা, প্লেগ, ইত্যাদিতে মানুষ আক্রান্ত হলে মরে না এবং এসবের সংক্রমণও ততো ব্যাপক হয় না।

দ্বিতীয় কারণ হলো পরিবার পরিকল্পনা। এতে নবজাতকের সংখ্যা কমছে, বুড়ো মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ধরা যাক, প্রতি স্বামী–স্ত্রী মাত্র একটি সন্তান উৎপাদন করছে। কিছুদিন পর দেখা যাবে কিশোর, যুবকের সংখ্যার চেয়ে বৃদ্ধের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এতেও কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের যদি একটি সন্তান আসে তাহলে আনুপাতিক হারে এমনিতেও নূতন প্রজন্মের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে পড়ছে। বৃদ্ধের সংখ্যা বেড়ে গেলে সমাজরথের অগ্রগতি ঝিমিয়ে পড়বে কি না লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। তারুণ্য সমাজকে এগোনোয় প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। বৃদ্ধরা একটা পর্যায়ে সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি ও বুড়ো মানুষের সংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। এ বক্তব্যকে পরিবার পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞরা অন্য দৃষ্টিতে দেখে ভিন্ন সমালোচনা করতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে বিষয়টি ভাবার মতো। চীনের উদাহরণ পর্যবেক্ষণ করলে বিষয়টির চিত্র স্পষ্ট ফুটে উঠবে। গড়ে প্রতি যুগলের ১.৮ বা ২.২ সন্তান জন্মালে দেশে মোটামুটি কিশোর+যুবক ঃ বৃদ্ধের অনুপাত–সাম্য বজায় থাকবে। এদের বয়সসীমা ২০–৩০ এর মধ্যে থাকার সময় মোটামুটি একটা বড় সংখ্যা থাকবে যা দেশের কর্মপ্রবাহকে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নেয়ায় সক্ষম হবে। অবশ্য এদেশের জন্য পরিবার পরিকল্পনার এ ব্যাপারটি জরুরি নয়। শিক্ষিত জনসম্পদের দেশের জন্যই মূলত তা প্রযোজ্য।

মানবদেহে তিনটি পর্যায় স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ১. দ্রুত বৃদ্ধি পর্যায় ঃ যা শিশুকে কিশোরে পরিণত করে, ২. যৌবন ও ৩. বার্ধক্য। অবশ্য প্রতিটি পর্যায়ের মাঝখানে চিহ্নিত কোনো প্রাচীর নেই। কৈশোর ও যৌবনের বৃদ্ধি পর্যায় অনেকটা স্পষ্ট ধরা গেলেও বার্ধক্য বিষয়ে রহস্যময় প্রহেলিকা লক্ষ্য করা যায়। যেমন পক্ককেশ, কুঞ্চিত চর্মের রিক্সাওয়ালার কথা ধরা যাক। বললাম চাচা, "যাবেন নাকি নিউমার্কেট ?" চাচা পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "চলেন"। যেতে যেতে এ কথা সে কথা বলছিলেন। দ্রব্যমূল্যের কথা সর্বাগ্রে। তারপর একসময় ঘর–সংসারে ছেলেপুলের কথা। দুটো মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন, একটা ছেলে সোমত্ত। তার বিয়ের বয়েস পার হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো হয়ে গেছেন। সংসারের কর্তব্য কাজগুলো তো সারতে হবে

ইত্যাদি ইত্যাদি। এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম "চাচার বয়স কতো?" তিনি আমতা আমতা করে বললেন, "বয়সের হিসেব-টিসেব তো জানি না, তা অনেক হবে। ব্রিটিশের স্বাধীনের সময় জন্ম"। শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম। বলেন কি ? আমার ধারণা তাঁর বয়েস কমপক্ষে পঞ্চান্ন থেকে ষাট। এমনি ধারণা বিপর্যয় যে, তিনি তো আমার চেয়েও বয়সে ছোট। আমার সন্তান তো এখনো কলেজের দোর-গোড়ায়। আমি চেপে গেলাম।

ভারতের অন্যতম প্রখ্যাত বার্ধক্যবিজ্ঞান গবেষক এম.এস. কানুনগোকে বার্ধক্যের বয়সসীমা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "আমি যখন বার্ধক্য নিয়ে গবেষণা শুরু করি তখন আমার বয়স ৩৫। সে সময় বার্ধক্যের সময়সীমা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করলে বলতাম বার্ধক্য ৪৫ বছরে শুরু হয়। ১০ বছর পর অর্থাৎ আমার ৪৫ বছর বয়সে কেউ একই প্রশ্ন করলে বলেছি বার্ধক্য শুরু ৫৫ বছর থেকে। এখন কেউ জিজ্ঞেস করলে বলি যখন কেউ অনুভব করেন যে তিনি বৃদ্ধ তখনই তাঁর বার্ধক্যের শুরু। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে। কারণ তাঁদের বার্ধক্য মগজের কর্মক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত, পেশীর সাথে নয়। পড়াশোনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ নিয়ে যাঁরা অধিকতরো ব্যস্ত থাকেন, তাঁদের বার্ধক্য শুরু হয় দেরিতে এবং ধীরে। কাজেই বার্ধক্য আপেক্ষিক ব্যাপার। কোন্ ধরনের পেশায় একটি মানুষ নিয়োজিত থাকেন, তার উপরই বার্ধক্যের সময়সীমা নির্ভর করে। বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে সময়ানুপাতিক বার্ধক্যসীমা সে কারণে প্রযোজ্য নয়।"

তবু কথা থাকে পেশী, হাড়, স্নায়ু, মগজ প্রভৃতি তো ক্ষয়িষ্ণু অঙ্গ। এ সকলের মধ্যে অহর্নিশ পরিবর্তন ঘটছে। এসবের কার্যক্ষমতারও সীমা-পরিসীমা আছে। জীবনপরিক্রমার নানা পর্যায়ে নানান অঙ্গ কার্যক্ষমতা হারাতে শুরু করে। ২৫ বছর বয়সে সকল অঙ্গ চূড়ান্ত কার্যক্ষমতায় পৌছে। ৩০ বছর বয়স থেকে পেশীসমূহ কাজের ক্ষমতা ক্রমে হারাতে থাকে। অবশ্য ফুসফুসই সকল অঙ্গের আগে দ্রুত কর্মক্ষমতা হারাতে শুরু করে। ফুসফুসের বায়ু গ্রহণ ও বর্জনের পরিমাণ হ্রাস পেতে শুরু করে অন্যান্য অঙ্গের কার্যক্ষমতা কমে যাবার আগে। স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা পরিবহণের ক্ষমতা কেবল কমে খুব ধীরে। বার্ধক্য ও মৃত্যুর অর্থ এই নয় যে সকল অঙ্গের কার্যক্ষমতা শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে। রোগ বা অন্য কারণে বা একাধিক অঙ্গের কর্মক্ষমতা বেশ কমে যাওয়াও মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে। ঐ অঙ্গের মেরামত তখন আর সম্ভব হয় না এবং মৃত্যু অবধারিত হয়। দেখা যায় ৪০/৫০ বছর বয়স্ক মানুষের হৃৎযন্ত্র বা বৃক্ক বা যকৃৎ নষ্ট হয়ে গেছে বটে, অন্য সকল অঙ্গের কার্যক্ষমতা

চূড়ান্তভাবে উৎকৃষ্ট, তবু লোকটি মরে যায়। প্রশ্ন হতে পারে এক বা একাধিক অঙ্গ বিনষ্ট হয়ে গেলে বা কার্যক্ষমতা হারালে অথচ অন্য সব অঙ্গ কর্মক্ষম থাকা সত্ত্বেও লোকটি মারা যায় কেনো ? এ কথা সত্যি সকল অঙ্গের ক্ষেত্রে এমনটি নাও ঘটতে পারে। যেমন একটি হাত বা একটি পা বা একটি কান কেটে গেলে লোক মরে না। অতি অপরিহার্য কিছু অঙ্গ আছে যাদের কার্যক্ষমতা না থাকলে সমগ্র দেহতন্ত্র অচল হয়ে যায়। তেমন অঙ্গের উদাহরণ হলো ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, বৃক্ক, পরিপাক নালী ইত্যাদি। এ সকলের একটির কাজের সাথে অন্যটির সমন্বিত (integrated) কার্যক্রম রয়েছে। একটি অঙ্গ কর্মে–অক্ষম হলে কার্যশৃঙ্খল (work-chain) নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সর্বদৈহিক কার্যক্ষমতা কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দেহ নিস্পন্দ হয়ে পড়ে।

নির্দিষ্ট জীবনসীমা নির্ধারণ করে জিন। পুরো মানবদেহ কোষ দিয়ে তৈরি। কোষের মধ্যে থাকে ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোম জিন দ্বারা নির্মিত। পিতৃ ও মাতৃ জনন কোষ বিভাজিত হয়ে অপত্যকোষ সৃষ্টি করে যা শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নামে পরিচিত। ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিলে তৈরি হয় ভ্রূণ। অপত্যকোষে পিতা ও মাতার ক্রোমোজোমের সমাবেশ ঘটে। অর্থাৎ ভ্রূণ পিতা ও মাতা থেকে ক্রোমোজম লাভ করে। এই ক্রোমোজমস্থিত জিনই নবজাতকের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে থাকে। বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে বার্ধক্য ও জীবনসীমার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। সকল ধরনের জীবে এ কাণ্ডটি ঘটে। যেমন, ড্রসোফিলা নামের ফলের মাছি মাত্র সর্বোচ্চ ৩৫ দিন বাঁচে। ইঁদুর বাঁচে তিন বছর। আর মানুষের পরমায়ু ১০০ বছর। এই সময়–সীমা অতিক্রম করে যাঁরা বেঁচে থাকেন তাঁরা ব্যতিক্রম। বার্ধক্য ও পরমায়ুকে দূষণ, জলহাওয়া, তাপমাত্রা, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও অন্যান্য শারীরতাত্ত্বিক কারণসমূহ প্রভাবিত করে।

একটি মানুষের দেহ ও মনের স্বাস্থ্য ও জীবন–পরিক্রমা সামাজিক কারণসমূহ যেমন জীবনধারণ পদ্ধতি ও পেশার উপর নির্ভরশীল। মানুষটি জন্মের পর থেকে তার দেহে অবিরাম জৈবিক কর্মকাণ্ডগুলোর রূপান্তর সাধন হতে থাকে এবং লক্ষণীয়ভাবে অধিক হারে, জীবনধারণের শর্তাবলী, পরিবেশ ও অনেক অঘোষিত ঘটনাক্রম তার উপর প্রভাব ফেলে। আবেগ, শারীরতাত্ত্বিক কারণসমূহ, সামাজিক শর্তসমূহ ও জৈবিক কর্মকাণ্ডের উপর বার্ধক্য নির্ভরশীল। অতি শোক–তাপজনিত আবেগ, হতাশা–বঞ্চনা–প্রতারণা সৃষ্ট আবেগ মানুষের মনে প্রবল ছায়াপাত করে। মন থেকে দেহে তা সঞ্চারিত হয়। ক্রমে তা জৈবনিক ক্রিয়াকাণ্ডে প্রভাব ফেলে। দেহস্থ অঙ্গসমূহ প্রভাবিত হয়। ওসবের কর্মক্ষমতায় তার স্বরূপ প্রকাশিত হতে থাকে। যাকে বলা হয় সিম্পটম বা লক্ষণ বা সঙ্কেত। অতিশ্রমজনিত ক্লান্তি, ঘর্ম নিঃসরণ, রক্তশূন্যতা,

বাত–পিত্ত–কফের আধিক্য, টেনশন, আশংকা, মানসিক নানান ধরনের চাপ ইত্যাদি শারীরতাত্ত্বিক ব্যাপারগুলোও দেহের উপর প্রভাব ফেলে। এতে নানা অঙ্গ নানাভাবে আক্রান্ত হয়। সমাজের চতুষ্পার্শ্বের যে পরিমণ্ডলে মানুষটির দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ঘটে সে পরিমণ্ডলের সুস্থতা ও অসুস্থতা সঙ্গতকারণে মানুষটির উপর প্রভাব ফেলে। সুষম খাদ্যের অভাব, নির্দিষ্ট পুষ্টিমাণযুক্ত খাদ্যের ঘাটতি, অতিখাদ্য গ্রহণ ও অতিপুষ্টি গ্রহণ ইত্যাদিও বার্ধক্য বিকাশে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

বিজ্ঞানী কানুনগোর মতে কম খেলে পরমায়ু বাড়ে। খনার বচনের কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। খনা বলেছিলেন–উনো ভাতে দুনো বল। কানুনগো ইঁদুরের উপর গবেষণা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। নিয়ন্ত্রিত খাদ্য বিপাক হার কমায়। এতে ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যায়।

অনেকে মনে করেন ব্যায়াম বা শরীরচর্চা দ্বারা পরমায়ু বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে নির্দিষ্ট বয়সের পর ব্যায়াম অঙ্গসমূহের উপর অকল্যাণকর প্রভাব ফেলে। ব্যায়াম অনেকক্ষেত্রে অসংখ্য কষ্টেরও কারণ হয়। তবে যোগাভ্যাস রাখতে পারলে উত্তম। শ্বাস টেনে কিছুক্ষণ ধরে রাখা গেলে (অন্তত ৩০ সেকেণ্ড) কোষকলা অবাত শ্বসনাধীন থাকায় অভ্যস্ত হয়। এভাবে শ্বাস ধরে রেখে ধীরে ধীরে ছাড়ার নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের সাহায্যে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় রক্ত জমাট বাঁধাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। যোগব্যায়ামের জন্যও অবশ্য প্রশিক্ষক প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ ছাড়া করলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

ভারতের বিজ্ঞানী কানুনগোর নেতৃত্বে একদল গবেষক বর্তমানে একটি এনজাইম আবিষ্কার করেছেন। এর নাম আইসোএনজাইম। এই এনজাইম বয়সবৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। তাঁরা আরো লক্ষ্য করেছেন যে প্রোটিনের প্রাথমিক কাঠামো (এমিনো এসিডের কথা বলা হচ্ছে) বয়স বাড়ার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় না, যা আগে উল্টোটা ভাবা হতো। এ বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়েছে এবং একটা পদক্ষেপের পর আরেকটা পদক্ষেপ দিয়ে এগোনো হয়েছে। এক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যুক্তিসম্মতভাবে এনজাইম থেকে জিন পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে যা তাদের লক্ষ্য ছিলো। গত দুদশক ধরে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ধক্য বিজ্ঞান গবেষণায় অনেক অগ্রগতি হয়েছে। বার্ধক্যের মূল কারণ নির্ণীত হয়েছে জিন স্তরে। জৈবরসায়ন, আণবিক জীববিজ্ঞান ও জীন প্রযুক্তি কৌশলের সাহায্যে তাঁরা ইঁদুরের বার্ধক্য–প্রাপ্তির জন্য দায়ী কতিপয় বিশেষ জীন কিভাবে ও কেনো পরিবর্তিত হচ্ছে তা লক্ষ্য করেছেন। এ ছাড়া বয়স্ক মানুষের অধিকতরো ক্যানসার আক্রান্ত

হবার বিষয়টিও পর্যবেক্ষণ করছেন। বার্ধক্য সৃষ্টিতে অনকোজিন (Oncogenes) কী ভূমিকা নেয় তাও দেখার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। তাঁরা ইতোমধ্যে কিছুটা আশার আলোক দেখেছেন। তাঁরা মস্তিষ্কে কিছু এনজাইমকে উচ্চস্তরে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং এদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক ইঁদুরে ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁরা এভাবে বিশেষ কিছু জিনের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করছেন যাতে বৃদ্ধ বয়সে এ সবের কর্মক্ষমতা হ্রাস না পায়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনের কার্যাবলী লক্ষ্য করা এবং এসবের পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। আগেই বলা হয়েছে, গবেষণা করা হয়েছে ইঁদুর নিয়ে। ধরা যাক ইঁদুরের গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনের কথা। জিনের নাম থাইমাইডিন কাইনেস। এটি ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবোস নিউক্লিয়েইক এসিড–কোষের একটি উপাদান) বিশ্লেষণ ও কোষ বিভাজনের সময় কাজে আসে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনের নাম ফাইব্রোনেকটিন। এটি অন্তকোষ ক্রিয়া ও অঙ্গসংগঠনের জন্য অপরিহার্য। সাইটোক্রোম পি–৪৫০ নামের জিন দেহে প্রবিষ্ট ক্ষতিকর পদার্থসমূহকে নির্বিষ করে ও নিষ্ক্রান্ত করে। এ ছাড়া অর্বুদ সৃষ্টিকারী কিছু অনকোজিন নিয়েও গবেষণা চলছে। দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধবয়সে ক্যানসারের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে বেশি। শেষোক্ত জিনের সাথে বার্ধক্য প্রক্রিয়ার কিছু সম্পর্ক থাকতে পারে।

ডিএনএ কোষের অধিকাংশ কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে অথবা জিনের অন্তর্গত উদ্যোক্তা অঞ্চল এই নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা নেয়। জীন প্রযুক্তি কৌশল ব্যবহার করে উদ্যোক্তা অঞ্চলের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধরন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। দেখা হচ্ছে বার্ধক্যকালে নিউক্লিয়াসের কতিপয় প্রোটিন ফ্যাক্টরের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে কি না। বিজ্ঞানীরা আরো চেষ্টা করছেন অন্তঃস্রাবী হরমোনের মধ্যে কোনোটি প্রোটিনের পরিবর্তনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারে কি না।

তাহলে শেষতক পরমায়ু রহস্য কি আবিষ্কার করা সম্ভব ? কোনো প্রাণীর পরমায়ু মাত্র কয়েক ঘন্টা। কারো কয়েক বছর, কারো শত বছর। আবার একই প্রজাতির কিছু সদস্যের পরমায়ু স্বল্প, কারো পরমায়ু দীর্ঘ। স্বল্পায়ুর কারণ বের করা সহজ নয়। অন্যদিকে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার কৌশলও রহস্যঘেরা। মানুষের জীবনধারণ পদ্ধতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সাধারণত তারাই দীর্ঘজীবী হয় যারা মদ্যপান, ধূমপান করে না এবং খাদ্যাভ্যাসকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখে। এরা সুষম খাবার গ্রহণ করে, ব্যায়াম করে। এদের ঘুম খুব গভীর। এরা দূষণমুক্ত বাতাস গ্রহণ করে এবং টেনশনহীন জীবনযাপন করে। এরা চারপাশের ও পরিবারের ঘটনাবলীকে সহজভাবে ও নিরাসক্তভাবে গ্রহণ করে। কোনো ঘটনা তাদেরকে অতি আনন্দিত বা অতি দুঃখিত

করতে পারে না। এরা অতি লোভী নয়। যার জন্য অপরিমিত কায়িক ও মানসিক শ্রম দেবার আবশ্যক হয় না। সম্ভবত এরা মানসিক দিক থেকে খুবই দৃঢ় ও অনড় থাকেন। তাদের জীবনে ঝড় এলেও মুচড়ে দিতে পারে, ভেঙে ফেলতে পারে না। নিস্পৃহ, শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনই হয়তো দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনলাভের অন্যতম উপায়। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, সুস্থদেহে দীর্ঘদিন কর্মক্ষম থাকাই হলো প্রকৃত লক্ষ্য। গবেষক, বিজ্ঞানীদের চেষ্টাও মানুষকে দীর্ঘ কর্মক্ষম জীবনদান করা।*

---

* 'সায়েন্স রিপোর্টার' পত্রিকায় ১৯৯১ সানের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় বিজয় কৌশিক গৃহীত প্রফেসর কানুনগো' র একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিলো। সেই সাক্ষাৎকার অবলম্বনে এই নিবন্ধ রচনা করা হয়েছে। বিজয় কৌশিক মস্কোস্থ একাডেমী অব সায়েন্সেস-এর অধীনে ইনস্টিটিউট অব মলিক্যুলার জেনেটিক্স-এ পি.এইচডি গবেষক। প্রফেসর এম.এস. কানুনগো ভারতীয় এসোসিয়েশন অব জেরান্টোলজির সভাপতি, গবেষক, বিজ্ঞানী।

ভাইরাস গবেষণা

ভাইরাস নামটির সাথে আজকের মানুষ কমবেশি পরিচিত। ভাইরাস আবিষ্কৃত হবার পর থেকে মানুষ একে নিয়ে ভাবিত। এর সম্বন্ধে যতোই নানান তথ্য জানা যাচ্ছে মানুষ ততো বেশি আতঙ্কগ্রস্থ হচ্ছে। গুটি বসন্তের কারণ হিসেবে একপ্রকার ভাইরাসকে দায়ী করা হয়। গুটি বসন্ত এক সময় মানুষের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলো। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা গুটি বসন্ত পৃথিবীতে আর নেই বলে ধারণা করছেন। এর অর্থ গুটি বসন্ত সৃজক ভাইরাসটি হয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, নতুবা এটি তার আক্রমণের শক্তি হারিয়েছে। অধুনা আরেকটি ভাইরাস মানুষকে মহা আতঙ্কের মুখোমুখি করে রেখেছে। এর নাম এইডস ভাইরাস। এইডস সৃষ্টিকারী ভাইরাসকে কিভাবে বাগে আনা যায় তা নিয়ে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে গবেষণা করা হচ্ছে। বলতে গেলে আজ সারা পৃথিবীর মানুষ এইডস–এর ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে মহা দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেছে।

ভাইরাস শব্দের অর্থ পিচ্ছিল তরল পদার্থ যা পুঁতিগন্ধময় বা বিষাক্ত। ভাইরাস ল্যাটিন শব্দ। ভাইরাস বিষয়ে অভিধানের ব্যাখ্যা হলো–এই বিষ মানবজাতির জন্য অশেষ দুঃখভোগের কারণ। এইডস, পোলিও, হলুদ জ্বর, জলবসন্ত, হাম, সাধারণ সর্দি–কাশ, হার্পিস (এক প্রকার চর্মরোগ), শিগেলা (আমাশয় বিশেষ), টিউমারসহ বহু ব্যাধির পোষকের কারণ হলো ভাইরাস।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য ভাইরাসকে মানুষের উপকারে লাগানোর ব্যাপারেও আশাবাদী। তাঁদের ধারণা ভাইরাস জীবের বিবর্তনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকতে পারে। ডিএনএ প্রযুক্তির অভাবিতপূর্ব বিকাশের ফলে বিজ্ঞানীদের উপরিলিখিত আশার বাস্তবায়ন সম্ভব মনে হচ্ছে। বর্তমানে জৈব–প্রযুক্তিক গবেষণাগারে কম ক্ষতিকারক ও মানবদেহে সাহায্যকারী প্রকরণের ভাইরাস উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। গবেষণাগারে উৎপাদিত ভাইরাসকে জিন দ্বারা রোগ চিকিৎসায় ব্যবহার করা যেতে পারে। জিন দিয়েই কোষের ক্রোমোজোম গঠিত হয়। জিনেরই একটি উপাদান হলো ডিএনএ।

মানবজীবনে ভাইরাসের ব্যাপক ভূমিকার কথা স্মরণে রেখে বিজ্ঞানীদের মনে মৌলিক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে যে, ভাইরাস কি জীব ও জড়ের মধ্যে এক অদৃশ্য ছায়াপ্রাচীর ? জীবের উদ্ভব ও বিবর্তনে ভাইরাসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো ভূমিকা রয়েছিলো কি ?

ভাইরাস প্রকৃতপক্ষে নিউক্লিয়েইক এসিড ও প্রোটিন যৌগসমূহের সংশ্লেষিত রূপ। একে জটিল জৈব অণুর স্ফটিক বলা যায়। বালি, কয়লাকে যে ভাবে স্ফটিকে পরিণত করা যায়, ভাইরাসও তেমনি স্ফটিকে পরিণত করা সম্ভব হয়। ভাইরাস জৈব স্ফটিকের তুল্য হলেও, ভাইরাস অন্য যেসব কাজ করে তা জৈব স্ফটিকের পক্ষে করা সম্ভব নয়। ভাইরাস জীবকোষে অনুপ্রবেশ করে ও প্রজনন ঘটায়। অন্য অণুজীব বা ব্যাকটেরিয়া জীবদেহে যেভাবে রোগ সংক্রমিত করে, ভাইরাসও তেমনভাবে জীবদেহে রোগ সংক্রমণ ঘটায় এবং পোষকের মৃত্যুর কারণ হয়।

অবশ্য সাধারণ অণুজীব বা ব্যাকটেরিয়ার কর্মকাণ্ডের সাথে ভাইরাসের কর্মকাণ্ডের মৌলিক তফাৎ রয়েছে। অণুজীব বা ব্যাকটেরিয়া জীবন্ত কোষের সংস্পর্শ ছাড়া বংশবৃদ্ধি করতে পারে এবং এরা সাধারণ বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ কাজটি করতে পারে। কিন্তু ভাইরাস জীবন্ত কোষের সংস্পর্শ ছাড়া বংশবৃদ্ধি করায় অক্ষম। বিজ্ঞানীরা জেনে গেছেন যে, জড় মাধ্যমে ভাইরাসের চাষ অসম্ভব। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় ভাইরাস কি মৃত অণু অথবা "জীবন্ত" রোগ–উৎপাদক জীবাণু ? প্রশ্নটা এরকম ইলেকট্রন কি একটা তরঙ্গ না কণামাত্র ? এর উত্তর হাঁ বা না অর্থাৎ দ্ব্যর্থবোধক।

ভাইরাস নানান আকার ও আকৃতির হতে পারে। খুব বড় আকারের ভাইরাসকেও দেখতে হলে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ চাই। সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্রে এদের দেখা যায় না। তাহলে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কারের আগে ভাইরাসের বিষয়ে কি জানা যায় নি! অবশ্যই জানা গেছে। তবে আকস্মিকভাবে। ব্যাকটেরিয়ার ফাঁদেই প্রথম ভাইরাস ধরা পড়েছিলো। ব্যাকটেরিয়া ফিল্টার বা পরিস্রবণ করার সময় ভাইরাস ধরা পড়ে। ভাইরাস পরিস্রাবক গলিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

ভাইরাসের দেহের আয়তন ন্যানোমিটার দিয়ে মাপা হয়। এক ন্যানোমিটার সমান এক মিটারের এক বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ। বোঝাই যাচ্ছে ভাইরাস কতখানি ক্ষুদ্র। একটি নির্দিষ্ট ভাইরাসের কথা বিবেচনা করা যাক। মানুষের অন্ত্রের বাসিন্দা *Escherichia coli* কে সাড়ে পাঁচ ফুট দীর্ঘ একটি মানুষের সমান আকারের করতে হলে এই ভাইরাসটিকে কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার গুণ বড় করতে হবে।

মানুষের সাধারণ কোষের আয়তন ১০ মাইক্রোমিটার যা এক মিটারের মিলিয়ন ভাগের দশ ভাগের সমান। মানুষের সাধারণ কোষকে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার গুণ বিবর্ধিত করলে তা ৪০০ বর্গফুট ক্ষেত্রবিশিষ্ট একটি প্রকোষ্ঠের সমান আকার ধারণ করবে। সবচেয়ে বড় আকারের ভাইরাস ভ্যাক্সিনিয়া। এটি গুটি বসন্তের কারণ। একে ৫,৬০,০০০ গুণ বড় করলে তা আকারে একটি ছোট সাইজের তরমুজের মতো দেখাবে। ক্ষুদ্রতম ভাইরাস হলো পলিও ভাইরাস। একে ৫,৬০,০০০ গুণ বড় করলে সিকি মুদ্রার চেয়ে ছোট দেখাবে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভাইরাস মুক্তভাবে থাকে বলেই আকারে ক্ষুদ্র হয়ে থাকে। একটি কোষকে বেঁচে থাকার জন্য তাঁর মধ্যে যে সকল উপাদানের প্রয়োজন সেসকল উপাদান ভাইরাসের মধ্যে নেই। ফলে এর গঠন অতি সরল। একই কারণে পরজীবী জীবনযাপনই এর নিয়তি। ক্ষুদ্রতম জীবকোষে যে সকল উপাদান থাকে সর্ববৃহৎ ভাইরাসেও তার ঘাটতি থাকে। এসব কারণে বিজ্ঞানীদের সংশয় যে ভাইরাস আদৌ জীবসত্তা কি না!

ভাইরাসের সরলতম রাসায়নিক গঠন রীতিমতো বিস্ময়কর। অতি আদি জীবের দেহ গঠনের চেয়েও এর দেহ গঠন অনেক বেশি সরল। একটু উন্নত অণুজীবের কোষে আরএনএ (রাইবোস নিউক্লিয়েইক এসিড) ও ডিএনএ থাকে। ভাইরাসে দুটোর একটা থাকে। উল্লেখ্য, আরএনএ ও ডিএনএ জীবের বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করে। কোনো ভাইরাসে দুটো এসিড এক সাথে থাকে না। প্রথমদিকে বিজ্ঞানীরা ভাইরাসে আরএনএ বা ডিএনএ-এর অস্তিত্ব ধরতে পারেন নি। ফলে ভাইরাস জড় না জীব এ সন্দেহ আরো বেশি গভীর হয়েছিলো। সর্বপ্রথম ব্যাপক গবেষণা হয় টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (সংক্ষেপে টিমোভা) নিয়ে। টিমোভায় প্রোটিন ছিলো শতকরা ৯৪ এবং নিউক্লিয়েইক এসিড (আরএনএ বা ডিএনএ) ছিলো শতকরা ৪ ভাগ।

১৯৩৫ সনে আমেরিকার জীব রসায়নবিদ ওয়েন্ডেল মেরিডিথ স্ট্যানলি টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাসের প্রোটিন পৃথক করে দেখান। তার ধারণা ছিলো এটি একটু প্রোটিন অণু মাত্র। তিনি এর বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জন্য একে কেলাসে বা ক্রিস্টালে পরিণত করতেন। সে সময় বিজ্ঞানীরা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর বিশুদ্ধতা প্রমাণের লক্ষ্যে প্রোটিনকে কেলাসে পরিণত করতেন। প্রোটিন পৃথককরণ পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য স্ট্যানলিকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। স্ট্যানলির সাথে যুগ্ম নোবেলজয়ী হলেন জেমস সামার। তিনিও একটি বিশুদ্ধ প্রোটিন অণুকে কেলাসে পরিণত করেছিলেন। সে প্রোটিন অণুটি ছিলো ইউরিয়েস এনজাইমের।

তামাক পাতা যে রোগের কারণে বিচিত্র রূপ ধারণ করে সে রোগবস্তুতে প্রথমবারের মতো টেস্টটিউবে কেলাসে পরিণত করার উদ্ভাবন কৌশলটাই ছিলো বিস্ময়কর। বিজ্ঞানীদের জানা ছিলো যে চিনি ও লবণের মতো জড় বস্তুই কেবল কেলাস গঠন করে। জৈববস্তু নয়। যে সকল বস্তুর বা অণুর নিয়মিত ও নির্দিষ্ট জ্যামিতিক গঠন থাকে সে সবেরই কেলাসন ঘটে। স্টিরিও–কেমিস্ট্রির সূত্রানুযায়ী এ সকল অণু নির্দিষ্ট ছকে পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়। কোষের প্রোটোপ্লাজম নিয়ত পরিবর্তনশীল। এর রাসায়নিক অণু সমষ্টির গঠন নিয়মিত ও সুষম নয়। ফলে কোষবস্তু কেলাস গঠন করে না।

কেলাসিত ভাইরাসের রোগাক্রমণের ক্ষমতা লোপ পায় না। স্ট্যানলি টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাসকে তরল দ্রবণে দ্রবীভূত করার পরও তা পুরোমাত্রায় রোগাক্রমণ করায় সক্ষম ছিলো যেমনটি মূল ভাইরাস করতে পারতো।

১৯৩৭ সনে ব্রিটিশ জীবরসায়নবিদ ফ্রেডারিক সি বউডেন ও নরম্যান ডাব্লিউ পিরী দেখান যে টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাসের সবটাই প্রোটিন নয়। এর ৯৫ ভাগ প্রোটিন ও ৫ ভাগ নিউক্লিয়েইক এসিড। এতে প্রমাণ হলো ভাইরাসের দেহ নিউক্লিও-প্রোটিন দ্বারা গঠিত। নিউক্লিও-প্রোটিন রাসায়নিকভাবে প্রোটিন ও নিউক্লিয়েইক এসিডের সুস্থিত সংযোগ মাত্র। আরো পরে নানান ধরনের ভাইরাসকে কেলাসিত করা হয়। এদের অধিকাংশই নিউক্লিওপ্রোটিন গঠিত। তবে কোনো কোনোটিতে বাড়তি হিসেবে লিপিড ক্যাপসুলও থাকে।

জৈবরূপ ধারণ

ভাইরাস নামক কথিত জড়বস্তু পোষকের দেহকোষে জীববস্তুতে পরিণত হয় কি না একটা বড় প্রশ্ন। বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজি বা ভাইরাসবিজ্ঞানের অধ্যাপক হেন্‌জ্‌ এল ফ্র্যাঙ্কেল–কনরাড ১৯৫৫ সনে ভাইরাস জড় না জীব তা প্রমাণের লক্ষ্যে অনেকগুলি পরীক্ষা চালান। তিনি টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাসের প্রোটিন অংশকে নিউক্লিয়েইক এসিড থেকে আলাদা করেন এবং প্রতিটি অংশ দিয়ে রোগাক্রমণের প্রয়াস পান। তিনি দেখেন যে, স্বতন্ত্র অংশ রোগাক্রমণে সক্ষম নয়। এর সাথে নিউক্লিয়েইক এসিডকে যুক্ত করলেই কেবল তা সম্ভব হয়। এই পরীক্ষা বিষয়ে পত্র–পত্রিকায় "টেস্ট টিউবে জীবনের সৃষ্টি" সম্ভব হয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়।

ফ্র্যাঙ্কেল–কনরাড একে টেস্টটিউবে জীবনের সৃষ্টির বক্তব্যকে অস্বীকার করেন। তিনি একে জীবনের পুনর্গঠন বলতে চান। তবে পুনর্গঠনের এই কাজটিও ছিলো এক অনন্য ঘটনা। পরিপূর্ণ ভাইরাস কণার পুনর্গঠন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়। এতে এনজাইম বা রহস্যময় জীবনীশক্তির দৌত্যগিরির প্রয়োজন পড়ে না। আপনি ইচ্ছে করলে মাত্র একটি ভাইরাসকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে পারেন বা এক সাথে রাখতে পারেন। মূল টোব্যাকো মোজাইকে ভাইরাস যেভাবে তামাক গাছকে আক্রমণ করে এবং তামাক গাছের কোষে বংশবৃদ্ধি করে পুনর্গঠিত ভাইরাসও অনুরূপভাবে তামাক গাছকে আক্রমণ করতে পারে এবং নিজেদের বংশবৃদ্ধি করায় সক্ষম হয়। ফ্র্যাঙ্কেল–কনরাড এক ভাইরাসের নিউক্লিয়েইক এসিড স্ট্রেইন (X) এবং অন্য ভাইরাসের প্রোটিন স্ট্রেইন (Y) অংশ নিয়ে সংকর ভাইরাস সৃষ্টি করেন। এই সংকর ভাইরাস যে কোষকে আক্রমণ করে সে কোষের মধ্যে সৃষ্ট ভাইরাসের নিউক্লিয়েইক এসিড ও প্রোটিন স্ট্রেইন দুটোই (X) এক হয়। অর্থাৎ X হয়। আবার Y–স্ট্রেইনের নিউক্লিয়েইক এসিড ও X স্ট্রেইনের প্রোটিন যোগে সৃষ্ট সংকর ভাইরাস পোষকের কোষে যে বংশবৃদ্ধি ঘটায় সে সবের নিউক্লিয়েইক এসিড ও প্রোটিনের চেয়ে নিউক্লিয়েইক এসিডের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আমেরিকার ব্যাকটেরিয়াবিজ্ঞানী আলফ্রেড ডে হারশে উপরিলিখিত প্রমাণটি আরো দৃঢ়ভাবে প্রমাণে সাফল্য দেখান। তিনি বলেন, পোষক কোষে কেবল নিউক্লিয়েইক এসিডের অংশই প্রবিষ্ট হয়। প্রোটিন আবরণ বাইরেই পড়ে থাকে। তিনি উভয় অংশে তেজস্ক্রিয় ট্যাগ ব্যবহার করে এর সত্যতা যাচাই করেন। এ ঘটনা পুনর্গঠিত সংকর ভাইরাসের প্রোটিন আবরণের রহস্য বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করে। কোষে প্রবেশের সময় যেহেতু প্রোটিন আবরণ পরিত্যাগ করে সেহেতু পুনর্গঠিত ভাইরাস কোষমধ্যে পুনরায় নতুন প্রোটিন আবরণ নির্মাণ করে।

ভাইরাসের নিউক্লিয়েইক এসিড কোষমধ্যে কী উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে ? প্রতিটি জীব প্রজননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ঘটায়। সে ক্ষেত্রে পিতা ও মাতার কোষ থেকে নিশ্চয়ই অপত্যকোষে জিন সংক্রামিত হয়। কিন্তু ভাইরাসে এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় এক ভিন্ন ও অনন্য উপায়ে।

প্রতিটি প্রজাতির জন্য নির্দিষ্ট ভাইরাস

ভাইরাস সকল জীবদেহে রোগাক্রমণ ঘটাতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভাইরাস নির্দিষ্ট প্রজাতিকে আক্রমণ করে। যেমন, ব্যাকটেরিয়া ও উদ্ভিদের ভাইরাস

প্রাণিদেহে আক্রমণ সংঘটিত করে না। স্বাভাবিক অবস্থায় একটি ভাইরাস একটি প্রজাতিকেই আক্রমণ করে। এ ছাড়া এরা পোষকের নির্দিষ্ট কোষকেই আক্রমণ করে। এইডস ভাইরাস মানুষের রোগ–প্রতিরোধক, T–কোষকেই আক্রমণ করে। সাধারণ সর্দির ভাইরাস আক্রমণ করে কেবল মানুষের শ্বাসনালীর উর্ধ্বাংশের কোষকে।

পূর্বে আলোচনা করেছি ভাইরাসে প্রোটিন আবরণ থাকে। পোষক কোষে থাকে কতকগুলো গ্রাহীবস্তু বা রিসেপ্টর। প্রোটিন আবরণের গ্রাহীবস্তুর সংলগ্ন হবার ক্ষমতার উপর ভাইরাসের আক্রমণ নির্ভর করে। গ্রাহীবস্তুর রাসায়নিক কাঠামোতে ত্রিমাত্রিক আকৃতি লক্ষ্য করা যায়। ত্রিমাত্রিক কাঠামোতে ভাইরাসের প্রোটিন আবরণ যুক্ত হয়। কাঠামো যেনো তালা আর প্রোটিন যেনো চাবি। তালায় চাবি যুক্ত হলে যে দৃশ্যের অবতারণা হয় এখানেও তেমনটি ঘটে। দেহের হরমোন এই গ্রাহীবস্তু উৎপাদন করে। ভাইরাস যাতে গ্রাহী বস্তুকে আকর্ষণ করতে পারে সে জন্যে ভাইরাস প্রোটিন আবরণ নির্মাণ করে।

প্রোটিন আবরণের ভিতরে নিউক্লিয়েইক এসিড থাকে। এই এসিড ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি করে। বংশবৃদ্ধি করে পোষক কোষের অভ্যন্তরে। প্রোটিন আবরণ পোষক কোষের সাথে যুক্ত হয় নিউক্লিয়েইক এসিডকে কোষের ভিতরে প্রবেশে সুযোগ করে দেয়ার জন্য। সে বিচারে প্রোটিন আবরণ ভাইরাসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভ্যাক্সিন দ্বারা সিক্ত কোষে প্রোটিন আবরণ যুক্ত হতে পারে না। তাই ভ্যাক্সিন শরীরের আগেভাগে ঢুকিয়ে রাখা হয়।

কোষের গায়ে প্রোটিন আবরণ স্পর্শ করার সাথে সাথে নিউক্লিয়েইক এসিড কোষের ভিতরে ঢুকে যায়। এরপর প্রোটিন আবরণের দায়িত্ব শেষ। কোষে নিউক্লিয়েইক এসিড ঢোকার পরপরই এটি লাপাত্তা হয়ে যায়। কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত একে খুঁজে পাওয়া যায় না। অদৃশ্য হবার বা অদৃশ্য থাকার সময় ভাইরাসের ধরনের উপর নির্ভর করে। কোষের বিপাক সাধনকারী অংশসমূহ এদের স্বাভাবিক ক্রিয়া বন্ধ করে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত হয়। ফলে কোষটি মরে যায় এবং প্রচুর সংখ্যক ভাইরাসবস্তু ছড়িয়ে পড়ে। ভাইরাসের প্রতি আসক্ত অন্যান্য পোষক কোষ ওসব ভাইরাসকে আকর্ষণ করে। এভাবে এরা আত্মঘাতী হয়।

ভাইরাস আক্রমণে এভাবে কোষগুলো ধ্বংস হতে থাকলে পোষক–দেহে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। সঙ্গে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকে অভাবিত হারে এবং আক্রমণও ভয়াবহভাবে বাড়ে। একটি পলিও ভাইরাস মানুষের শরীরে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ১০,০০০–এর অধিক ভাইরাসের জন্ম দিতে পারে। টিউমার

সৃজক ভাইরাসের নিউক্লিয়েইক এসিড পোষক কোষের জিনবস্তুর সাথে যুক্ত হয়। ফলে, তা কোষের ক্ষতিকর পরিবর্তনের কারণ হয়। এতে কোষের অতি বৃদ্ধি ঘটতে পারে এবং অধিক সংখ্যক ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে।

মৃত্যুর জগৎ

অণুজীব (ব্যাক্টেরিয়া, ফাঙ্গাই, এককোষী জীবসমূহ) ও জড় পদার্থের মধ্যে রয়েছে আরেক মৃতের জগৎ যারা নানাভাবে জীবনের স্পন্দন প্রকাশ করে। এরা যেনো ছায়া জগতের অধিবাসী। রোগ সৃষ্টি হবারই পর কেবল এদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুজীব। এক কথায় অণুর অণুজীব। অণুর অণু বা অণুতর জীব অনুসন্ধানের প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী লুই পাস্তরের অবদানের কথা স্মরণে আসে। তিনিই অণুজীব সন্ধানের পথিকৃৎ।

বিজ্ঞানীদের ধারণা প্রতিটি সংক্রামক রোগের পেছনে নির্দিষ্ট কোনো জীবাণুর ভূমিকা থাকে। রোগজীবাণু আবিষ্কারের সময়েই ভাইরাস ধরা পড়ে। ১৯৬২ সনে বি. রেইমার ও মুরিয়েল জে. ও ব্রিয়েন আমেরিকার কৃষি গবেষণাকেন্দ্রের মেরীল্যান্ডের বাল্টিমোর স্থিত কৃষি বিভাগে আলুর স্পিন্ডল টিউবার রোগের কারণ খোঁজায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা এ রোগ ভাইরাস–সৃষ্ট বলে অনুমান করেন, যেহেতু রোগটি ব্যাকটেরিয়া বা ফাঙ্গাই সৃষ্ট নয়। রেইমার এ বিষয়ে আরো গভীর অনুসন্ধান চালাতে থাকেন। তাঁর সাথে আরো যুক্ত হলেন আমেরিকার কৃষি বিভাগের উদ্ভিদ–ভাইরাসবিজ্ঞানের গবেষণাগারের বিজ্ঞানী টি.ও.ভিয়েনার। রেইমার ও ভিয়েনার গবেষণায় এক অবিশ্বাস্য ফললাভ করলেন। তাঁরা দেখলেন স্পিন্ডল টিউবার রোগের সৃজক একটি আস্ত ভাইরাস নয়, ভাইরাসের খণ্ডাংশ মাত্র। খণ্ডটি হলো আরএনএ–এর (রাইবোস নিউক্লিয়েইক এসিডের) অংশ। রেইমার ও ভিয়েনার ১৯৬৭ সনে পৃথিবীকে মৃতের জগতের অণুতর জীব বিষয়ে প্রথম শোনালেন। তাঁরা এর নাম দেন ভাইরাস–অণু বা ভাইরয়ড। অণুতর এই জীব জীবিত না মৃত–এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলো না, যেমনটি ভাইরাস বিষয়েও উত্তর মিলে না।

অদ্যাবধি জানা ক্ষুদ্রতম জীব হলো ভাইরাস–অণু। আলুর স্পিন্ডল টিউবার ভাইরাস অণু আরএনএ–র খণ্ডাংশের আণবিক ওজন ১,৩০,০০০। এই ওজন ক্ষুদ্রতম ভাইরাসের নিউক্লিয়েইক এসিডের ওজনের চেয়ে কম। ভাইরাস অণু বা ভাইরয়ড কিভাবে বংশবৃদ্ধি করে এবং কিভাবে উদ্ভিদে সংক্রমণ ঘটায় তা আজো অজানা। ১৯৮১ সন পর্যন্ত উদ্ভিদের পাঁচটি রোগের জন্য পাঁচটি ভাইয়রড–কে তর্কাতীতভাবে

সনাক্ত করা হয়েছে। প্রাণিদেহে ভাইরয়ড সংক্রমণ সংঘটিত করে কি না তা আজো জানা যায় নি।

বর্তমানে বিজ্ঞান জগতে শোরগোল তুলেছে প্রিয়ন তত্ত্ব। এই তত্ত্ব মহাবির্তকেরও সৃষ্টি করেছে। প্রিয়ন ভাইরাস ও ভাইরয়ডের জ্ঞাতি। ভাইরাস প্রোটিন ও নিউক্লিয়েইক এসিড গঠিত। ভাইরয়ড গঠিত কেবল নিউক্লিয়েইক এসিড দ্বারা। প্রিয়ন ?

প্রিয়ন নাম রেখেছেন বিজ্ঞানী স্ট্যানলে এম. প্রুসিনার। প্রুসিনার সানফ্রান্সিসকো-এর ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন। প্রোটিনঘটিত সংক্রামক কণা শীর্ষক বাকভঙ্গি থেকে বিজ্ঞানী এই শব্দটি চয়ন করেছেন।

অর্ধশতক ধরে এক জাতীয় রোগের কারণ হিসেবে ধীরক্রিয় ভাইরাসকে দায়ী করা হয়েছে। ধীরক্রিয়া ভাইরাস এ জন্যই বলা হতো যেহেতু এরা পোষকের দেহে দীর্ঘকাল অবস্থান করতো বটে কিন্তু এরা প্রকাশ পেতো না। অথচ এরা Creutzfeldt-Jacob Syndrome, Kuru, Scrapie-এর মতো মারাত্মক রোগের স্রষ্টা। জেকব সিন্ড্রোম মানুষের শরীরকে ক্রমেই শীর্ণ করতে থাকে। কুরু মগজের একটি মারাত্মক রোগ। এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে ক্রমেই বিপর্যস্ত করে ফেলে। নিউগিনির মেলানেশিয়ানদের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। মেষের এক প্রকার রোগের নাম স্ক্র্যাপি।

আশ্চর্যের কথা, জল্পনা কল্পনা যাই হোক না কেনো, ধীরক্রিয় ভাইরাস সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি। বাস্তবিকই, কোনো গবেষক উপরিলিখিত রোগরাজির কোনো নির্দিষ্ট ভাইরাসের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারেন নি। টি.ও.ভিয়েনার ১৯৬৭ সনে প্রথমবারের মতো ভাইরয়ড আবিষ্কারের পর এ সকল রোগের জন্য ভাইরয়ড দায়ী বলে সন্দেহ করা হচ্ছিলো।

১৯৮০ সনে স্ট্যানলি প্রুশিনার দাবি করেন যে, স্ক্র্যাপি রোগের কারণ ভাইরাস নয়, ভাইরয়ডও নয়। বরং এসবের বিপরীত এবং তা হলো প্রোটিন। তিনি আরো দাবি করেন যে এই বস্তু নিউক্লিয়েইক এসিড–শূন্য।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই প্রথম দাবি করা হলো যে, বংশগতি নির্ধারক বস্তুহীন অর্থাৎ নিউক্লিয়েইক এসিডহীন একটি প্রোটিন গঠিত দেহ রোগের কারণ হয়ে থাকে। দাবিটি ছিল খুব দৃঢ়। বংশবৃদ্ধির জন্য জীববিজ্ঞানকে নিউক্লিয়েইক এসিড বিশেষ করে ডিএনএ–এর উপর নির্ভর করতে হয়। ডিএনএ বাংশচরিত্রকে পরবর্তী প্রজন্মে বহন করে নিয়ে যায়। প্রিয়নে যদি নিউক্লিয়েইক এসিড না থাকে, তবে এর বংশবৃদ্ধি ঘটে কিভাবে ? এর জবাব এখনো অজানা।

বিজ্ঞান বিশ্ব প্রুশিনারের চরম উদ্ভট প্রিয়ন তত্ত্বকে সঙ্গতকারণে খুব ধীরে গ্রহণ করেছে। যাঁরা ভাইরাস বা ভাইরয়ড নিয়ে গবেষণা করছেন তাঁদের ধারণা সংক্রমণকারী এই প্রিয়ন কোনো না কোনো ভাবে নিউক্লিয়েইক এসিডের সাথে সম্পর্কিত।

১৯৮৬ সনে প্রুশিনার ও তাঁর সহকর্মীরা ঘোষণা দেন যে, তাঁরা সংক্রমণকারী প্রোটিন বিশুদ্ধকরণে সফল হয়েছেন। বিশুদ্ধ প্রোটিন ব্যবহার করে প্রিয়নের জন্য নির্দিষ্ট ডিএনএ খণ্ডাংশ অন্বেষণে তাঁরা প্রয়াস পান। এটি পাওয়া গেলে প্রিয়ন কিভাবে বংশবৃদ্ধি করে তার রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব হবে।

উপভাইরাস

১৯৬৮ সনে সাংবাদিক জোসেফাইন মারকোয়ান্ড প্রশ্ন তোলেন–ক্ষুদ্রতম জীব কোন্‌টি। তিনি সম্ভবত অণুতর বা ভাইরাস অণু ভাইরয়ড এবং প্রিয়নের দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন। এসবকে উপভাইরাসও বলা যায়। এই গ্রুপে অন্য সদস্যরা হলো স্যাটেলাইট ভাইরাস, ভাইরন, ভাইরুসয়ড ও ভাইরোজেন। ভাইরয়ড ও প্রিয়ন রোগ সৃষ্টি করে জানা গেছে। কিন্তু অপর চার সদস্য বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় নি।

ভাইরন ভাইরাসের মতো নিজেরা প্রোটিন আবরণ তৈরি করতে পারে না। পোষক কোষ ওদের প্রোটিন আবরণ নির্মাণ করে। ভাইরাসের মধ্যে চলমান আরএনএ খণ্ডাংশ হলো ভাইরুসয়ড। ভাইরোজেনকে স্বাভাবিক জিন সমষ্টি বলা হয় যারা নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করতে পারে। যদিও কোন্ পরিস্থিতিতে এ কাজটি সম্পন্ন হয় তা জানা যায় নি।

স্যাটেলাইট ভাইরাসের বিষয়টি কৌতূহলোদ্দীপক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি গবেষণা সার্ভিসের জ্যাকেবাস ক্যাপের এক ব্যাখ্যায় বলেন–"আমাদের ধারণা হলো–স্যাটেলাইট ভাইরাস নিউক্লিয়েইক এসিড ছাড়া আর কিছু নয়। এটি ভাইরাসের নিউক্লিয়েইক এসিডের সহায়তায় বংশবৃদ্ধি ঘটায়। কিভাবে এ সহায়তা আসে তা রহস্যময়।"

স্যাটেলাইট বহনকারী ভাইরাস একটি কোষে সংক্রমণ ঘটায় এবং একে এনজাইম সৃষ্টিতে বাধ্য করে। এনজাইম ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। স্যাটেলাইট এই এনজাইমকেই স্বীয় বংশবৃদ্ধির কাজে লাগায়।

এ পর্যন্ত স্যাটেলাইট ভাইরাস কেবল বৃক্ষেই সংক্রমণ ঘটিয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ইতালির একজন গবেষক অবশ্য ভিন্ন কথাও বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, এটি হেপাটাইটিস বি–ভাইরাসের সাথে জড়িত থাকে এবং রোগটিকে জটিল করে তোলে।

জ্যাকেবাদ ক্যাপের স্যাটেলাইট ভাইরাসের উপকারী ভূমিকার কথাও স্বীকার করেছেন। ভাইরাসসৃষ্ট রোগেই এর উপকারী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। স্যাটেলাইট ভাইরাস রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনে। ভাইরাস ও স্যাটেলাইট ভাইরাসের মধ্যে এনজাইম প্রতিলিপি নির্মাণে প্রতিযোগিতাই সম্ভবত এর অন্যতম কারণ।

ভাইরাস কেলাস থেকে আরম্ভ করে উপভাইরাস পর্যন্ত খতিয়ে দেখলে জীব ও জড়ের মধ্যে স্বচ্ছ কোনো চিত্র পরিস্ফুট হয় না। মৃতের জগতের অধিবাসীদের কথা চিন্তা করলে জীব ও জড় শব্দগুলোকে কেবল কথার মালাগাঁথা ছাড়া আর কিইবা বলা যেতে পারে। জীব ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় এক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

ভাইরাস ও উপভাইরাসের অস্তিত্ব জানার ফলে জীব ও জড় জগৎ বিষয়ক সংজ্ঞা পরিবর্তনে আমরা বাধ্য হচ্ছি। জীবজগতে আরো কতো বিচিত্র জীবের অস্তিত্ব আছে তা কে বলতে পারে। ওদের আমরা অনুসন্ধান করি নি বলে আমরা তাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি বা চাক্ষুষ করতে পারি নি। আমরা অসুস্থ হই। অসুস্থতার কারণ অন্বেষায় মেতে উঠি। তখন আমরা কিছু অণুজীবের সন্ধান পাই। সেক্ষেত্রে প্রিয়নই শেষ আবিষ্কার নয়। আরো কতো জীব আবিষ্কৃত হবে, তা এখনই কে বলতে পারে!

রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র

বিংশ শতাব্দী অনেক নিষ্ঠুরতা ও অমানবিক আচরণ দেখেছে। এ সবের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য ও বিভৎস নিষ্ঠুরতা হলো রাসায়নিক যুদ্ধ। আণবিক বোমা ছাড়া সাধারণ গোলা-বারুদ, বুলেট, রকেটের যুদ্ধ ক্ষতি করে সাময়িক এবং এতে কোনো এলাকার আপামর জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। রাসায়নিক অস্ত্র এলাকার কোনো মানুষকে রেহাই দেয় না। হত্যা করতে না পারলেও পঙ্গু বা কর্মশক্তিহীন করে দেয়। বুলেট, বারুদের যুদ্ধে অন্যান্য জীবের ও উদ্ভিদ জগতের বিশেষ ক্ষতি হয় না। রসায়ন-অস্ত্র অন্য জীব ও উদ্ভিদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে এবং এই ক্ষতি দীর্ঘদিন চলতে থাকে। কারণ রসায়ন বাতাস, জল ও মাটিকে দূষিত করে ফেলে। আণবিক যুদ্ধ সম্পর্কে সঙ্গত কারণে মানুষ অতি ভীত সন্ত্রস্ত। আণবিক যুদ্ধের প্রসঙ্গ এলেই মানুষ আজো চোখের জলে হিরোশিমা, নাগাসাকিকে স্মরণ করে। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ আজো আন্দাজ করতে পারছে না যে, রাসায়নিক যুদ্ধ আণবিক যুদ্ধ থেকেও ভয়াবহ আর বিধ্বংসী। এই যুদ্ধ আমাদের এই গ্রহের বসন্তকে চিরকালের জন্য নির্মূল করে দেবে।

প্রথম মহাযুদ্ধের একটি ঘটনা লক্ষ্য করুন। দিনটি ছিলো ১৯১৫ সনের ২২ এপ্রিল। ফরাসি সৈন্য বাহিনীর একটি দল চয়রন নামক স্থানে অবস্থান করছে। প্রস্তুতি নিচ্ছে জার্মান বাহিনীকে আক্রমণের। আকাশে মেঘের আকারে সবুজ হলদেটে গ্যাস খণ্ড তাঁদের দিকে আগুয়ান দেখে তারা বিস্ময়-বিহ্বল। মেঘ আকারে বেশ বড়। পুরো সেনা দল মেঘবাহিত গ্যাস পুঞ্জে আচ্ছাদিত হলো। কয়েক সেকেণ্ড পর ওরা সম্বিত ফিরে পেয়ে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিলো। হাঁস ফাঁস চললো সুস্থ বাতাবরণের। কিন্তু কোথাও সুস্থ বাতাসের অবশিষ্ট নেই। Ancient Mariner-এর নাবিকের অবস্থা "Water, water every where but not a drop to drink।" সৈন্যরা প্রাণ বাঁচাতে পালাতে চাইলো। সমগ্র এলাকা জুড়ে বিষাক্ত তাণ্ডব। কোথায় পালাবে? গ্যাসরাশি সাঁড়াশি দিয়ে ধরার মতো সকলের কণ্ঠ চেপে ধরলো।

অধিকাংশই প্রাণ হারালো। যারা বেঁচে রইলো তারা কেউ পঙ্গু হলো কেউ কর্মশক্তি হারালো।

প্রথম দিকে ওরা হকচকিয়ে ভাবলো এ আবার কেমন মেঘ ? যে মেঘ বৃষ্টি বয়ে আনে না। বয়ে আনে বিষাক্ত গ্যাস! এলোই বা কোথা থেকে! কে পাঠালো ? পৃথিবীতে প্রথম রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার তো, তাই, বিষয়টি বুঝতে সময় লেগেছিলো। বাতাসের গতি মেপে গতির অনুকূলে এই রাসায়নিক বাণ নিক্ষেপ করেছিলো জার্মান সমর নায়করা। রাসায়নিক যুদ্ধের এই সাফল্য জার্মান শিবিরে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিলো। কিন্তু মানবসভ্যতা সেদিন কেঁপে উঠেছিলো। গ্যাসের এক খণ্ড মেঘ সেদিন দশ সহস্র লোকের প্রাণবধ করেছিলো। এবং অক্ষম ও অসমর্থ করে দিয়েছিলো এর চেয়ে বেশি লোককে। জার্মানরা তখন ব্যবহার করেছিলো ক্লোরিন গ্যাস।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ১৯১৮ সালে ১২ প্রকারের কাঁদানে গ্যাস, ১৫ প্রকারের শ্বাসরোধক গ্যাস, ৪ ধরনের স্ফোটক সৃজক গ্যাস এবং ৩ প্রকার রক্তদূষক ও ৪ প্রকার বমনকারক গ্যাস উদ্ভাবিত হয়। বর্তমানে রাসায়নিক বোমাও উদ্ভাবিত হয়েছে। ফলে এর ব্যবহার আরো সহজ হয়েছে। কোনো গ্যাস মানুষের দেহে মৃদু উপদাহ সৃষ্টি করে। কোনোটি মানুষের তাৎক্ষণিক মৃত্যুর কারণ হয়। বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকা বিষাক্ত গ্যাস যুদ্ধের অনেক পরেও মানুষের ক্ষতি করে। এমনকি মৃত্যুও ঘটায়। যুদ্ধে ব্যবহৃত গ্যাসসমূহকে দূষণ–প্রকৃতি ও ক্ষতির বিচারে ছয় দলে ফেলা যায়, যথা, ১. কাঁদানে গ্যাস, ২. উপদাহসৃষ্টিকারী গ্যাস, ৩. স্নায়ু–বিধ্বংসী গ্যাস, ৪. রক্ত দূষক গ্যাস, ৫. শ্বাসরোধক গ্যাস ও ৬. পঙ্গুকারী গ্যাস।

কাঁদানে গ্যাস সবচেয়ে কম ক্ষতিকর গ্যাস। এটি চোখে লাগলে অনবরত চোখ দিয়ে পানি পড়ে এবং হাঁচি ও কাস ওঠে। উপদাহ সৃজক গ্যাস স্ফোটক জন্মায়। ফুসফুস ধ্বংস করে। অন্ধত্ব আনে এবং মৃত্যু ঘটায়। স্নায়ুবিধ্বংসী গ্যাস অপ্রতিরোধ্য পেশীকম্পন ও পেশীর আক্ষেপ সৃষ্টি করে এবং মৃত্যু ঘটায়। রক্তদূষক গ্যাস রক্তকণিকাকে ধ্বংস করে দ্রুত এবং মানুষের মৃত্যু ঘটায়। শ্বাসরোধক গ্যাস দ্রুত শ্বাসরোধ করে। ফুসফুস বিনষ্ট করে ও মৃত্যু আনে। পঙ্গুকারী গ্যাস মানুষকে ধীরে ধীরে শারীরিক ও মানসিক কর্মশক্তিহীন করে তোলে। ক্লোরিন, ফসজিন ইত্যাদি শ্বাসরোধক গ্যাস এবং উপদাহ সৃষ্টিকারক গ্যাস হলো মাস্টার্ড গ্যাস। এডামসাইট, ট্যাবুন, স্যারিন, সোম্যান প্রভৃতি স্নায়ু বিধ্বংসী এবং হাইড্রোজেন সায়ানাইড ও সায়ানোজেন ক্লোরাইড রক্তদূষক গ্যাস। এছাড়া বর্তমানে "Big eye bomb" ও

"Binary chemical weapon" আবিষ্কৃত হয়েছে। এরা শ্বাসরোধ, হৃদপিণ্ড পতনের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মৃত্যু ঘটাতে পারে। Vx নামক রসায়ন অস্ত্র স্পর্শ করলেই মৃত্যু ঘটে। GE নামের রাসায়নিক অস্ত্র মানুষের উদরাময়, অবিরাম মূত্রবেগ, মানসিক বিভ্রান্তি, দেহে আক্ষেপ, জীবনমৃত অবস্থা সৃষ্টি এবং এমনকি মৃত্যুও ঘটাতে পারে।

রাসায়নিক যুদ্ধ তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়বহুল। রাসায়নিক অস্ত্র গুদামজাত করায় বা স্থানান্তর করায় ও সরবরাহ করায় উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োজন পড়ে না। উৎপাদনেও উচুঁদরের কৌশলের আবশ্যক হয় না। অপেক্ষাকৃত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশ প্রবল প্রতিপক্ষ প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে রাসায়নিক অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার আশংকা ক্রমেই বাড়ছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরপর এ নিয়ে ভাবনা শুরু হয়। বিশ্ববিবেক নড়ে উঠে এবং নৈতিকভাবে এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য জনগণ সোচ্চার হতে থাকে। এ ব্যাপারে সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ সকল প্রয়াসের ফলে ১৯২৫ সনে জেনেভায় কয়েকটি দেশ বৈঠকে বসে এবং একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটিকে জেনেভা প্রোটোকল বলা হয়। চুক্তির মূল বক্তব্য হলো ঃ

"Whereas the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases and of all analogous liquids, materials or devices has been justly condemned by the general opinion of the civilized world ; and

Whereas the prohibition of such use has been declared in Treaties to which the majority of powers of the world are parties; and

To the end that this prohibition shall be universally accepted as a part of international law, binding alike the concience and the practice of nations :

Declare :

That the high contracting parties, so far as they are not already parties to Treatise prohibiting such use, accept this prohibition, agree to extend this prohibition to the use of bacteriological methods of warfare and agree to be bound as between themselves according to the term of this declaration."

চুক্তির সারমর্ম হলো, পৃথিবীর অধিকাংশ বড় শক্তি একত্রে মিলিত হয়ে শ্বাসরোধক, বিষাক্তকর গ্যাস ও তরল পদার্থকে যুদ্ধে ব্যবহার করাকে নিন্দা জানাচ্ছে

এবং ভবিষ্যতে রাসায়নিক অস্ত্রকে যুদ্ধে ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে। বিস্ময়ের কথা জেনেভা প্রটোকল প্রণীত হয়েছে ১৯২৫ সনে (সুইজারল্যান্ডের, জেনেভায়) অথচ ১৯৩৬ সন পর্যন্ত মাত্র ৪০টি দেশ এটিকে অনুমোদন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুমোদন করলো মাত্র ১৯৭৫ সনে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েৎনাম, কম্বোডিয়া থেকে শুরু করে অনেক রণক্ষেত্রে তার রণনীতির অংশ হিসেবে যুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে নির্লজ্জভাবে। নাপাম বোমার সেসব ভয়াবহ দৃশ্য এবং মা নদীতে রক্তস্রোতের কাহিনী পৃথিবীর জনগণ এখনো বিস্মৃত হয় নি। বিস্মৃত হয়নি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর অন্ধকূপ হত্যার বিভৎসতা। হাজার হাজার প্রাণবধ করা হয়েছে বিষাক্ত গ্যাসের ছোবলে।

জেনেভা চুক্তি সত্ত্বেও আজো অনেক দেশ রাসায়নিক অস্ত্র নির্মাণ এবং মজুদ বৃদ্ধিতে তৎপর রয়েছে। মিসাইল রাসায়নিক অস্ত্র নিক্ষেপে আরো সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এখন যে কোনো দেশ মিসাইলের সাহায্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে রাসায়নিক বোমা নিক্ষেপ করতে পারে। পঁচাত্তর বছর আগে জার্মানীতে রসায়ন-অস্ত্র প্রয়োগে বায়ুদূতের করুণার উপর নির্ভর করতে হয়েছিলো। আজ তার প্রয়োজন নেই। বর্তমানে আদেশমাত্রই ব্রহ্মাস্ত্র তা পৌছে দেবে নিমেষে। আমেরিকা সম্প্রতি Binary chemical weapon বা দ্বৈত রাসায়নিক বোমা বানাচ্ছে। একটি সেলে দুটো নির্দোষ রাসায়নিক পদার্থ রাখা হয় স্বতন্ত্রভাবে। পদার্থদ্বয়ের মাঝখানে থাকে এক্সপ্লোসিভ বা বিস্ফোরক। বিস্ফোরকে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের ব্যবস্থা আছে। স্বতন্ত্র পদার্থ দুটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে মিশ্রিত হলে মারাত্মক রাসায়নিক অস্ত্রের রূপ নেয়। দ্বৈত রাসায়নিক বোমা সহজে স্থানান্তরযোগ্য। মিসাইল দিয়ে পাঠানোও আয়াসসাধ্য। মাটি থেকে নিচু উচ্চতায় রাডারকে ফাঁকি দিয়ে অনায়াসে এই অস্ত্র নিক্ষেপ করা যায় শত্রু ঘাঁটিতে। এই বোমা নির্গত বিষ যে কতো ভয়াবহ তা আগে বলা হয়েছে।

বর্তমানে যে সব দেশে রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের ভাণ্ডার আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে যে সকল দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ইরাক, উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া, আফগানিস্থান ও ভিয়েতনাম অন্যতম। বিগত উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাক ইরানের বিরুদ্ধে রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করে। লিবিয়া ত্রিপোলীর উপকণ্ঠে বারতায় রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির কারখানা বানাবে বলে জানিয়েছিলো। রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ গড়ে তোলায় জার্মানিও পিছিয়ে নেই বলে জানা যায়।

তাহলে উপায় কী ? রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন যে কোনো দরিদ্র দেশের পক্ষেও সম্ভব। কারণ এর নির্মাণ উপাদানসমূহ সহজলভ্য এবং এ সকল উপাদানের

অধিকাংশই কীটনাশক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন-কৌশলও অনায়াসলভ্য। কীটনাশকের ছদ্মাবরণে যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন করলে ধরার উপায় নেই। কোন্ মিসাইল কী অস্ত্র বহন করছে তাও সনাক্ত করা দুঃসাধ্য। ১৯৮৯ সনের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত প্যারিস আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পৃথিবীর সকল দেশের প্রতি রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের মজুদ পরিমাণ জানাতে অনুরোধে জানানো হয়। সেই অনুরোধে অনুকূল সাড়া মিলেছে এমন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। ১৯৮৭ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র অন্য দেশের উপর ব্যবহার এবং অন্যদেশে বিক্রি নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানায়। তারা সে সময় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের শিখারীতে অবস্থিত রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ কারখানা ঘোষণা দিয়ে ধ্বংস করে। তাদের আচরিত ধর্ম অন্য কারো বিবেকে সাড়া জাগিয়েছে বলে মনে হয় না।

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন–মানুষ নিজের জন্য এবং তার ভবিষ্যতের জন্য সব সময় বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড সংগঠনে লক্ষ্য স্থির রাখবে....যাতে আমাদের মানসসৃষ্টি মানবজাতির জন্য অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হয়। বিজ্ঞানীর এই বাণী সবাই স্মরণে রাখলে পৃথিবী সমূহ সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে।

মহাকাশ গবেষণা

মহাকাশ গবেষণা বিশ্ববিজ্ঞানের অগ্রগতিতে চমকপ্রদ যুগান্তকারী ঘটনা। অথচ সম্প্রতি মহাকাশ গবেষণার যৌক্তিকতা নিয়ে মানুষের মনে জেগেছে নানান প্রশ্ন আর সন্দেহ। এই মানুষ মাত্র সিকি শতক আগে মানুষের চাঁদে পাড়ি জমানোর ঘটনাকে অপার বিস্ময়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলো। আজো বিশ্ব আলোড়নকারী ঘটনা ভূ উপগ্রহের মাধ্যমে মানুষ প্রতিদিন চাক্ষুষ করে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করে। এই মানুষেরই মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে মহাকাশ গবেষণার কোনো প্রয়োজন আছে কি ? যে গবেষণা মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না, যে গবেষণা মানুষের স্বস্তি হনন করে, মানুষের ভবিষ্যৎকে যে গবেষণা শংকিত করে তোলে সে গবেষণা সম্পর্কে সঙ্গত কারণে প্রশ্ন উঠতে পারে।

এ প্রশ্নের অবতারণা স্টার ওয়্যার বা তারকা যুদ্ধ থেকে। মানুষের আজ আলোচ্য বিষয় দুটি। কম্প্যুটার ও তারকা যুদ্ধ। উন্নত দেশে মানুষের পরিশ্রমের প্রায় সব কাজ করে দিচ্ছে কম্প্যুটার। তা মানুষের চেয়ে অনেক নিপুণভাবে। অনুন্নত দেশেও কম্প্যুটারের প্রচলন শুরু হয়েছে। কম্প্যুটার মানে মানুষের বিকল্প ছায়া মানুষ। যন্ত্র মানুষের শ্রম লাঘব করেছে। মানুষের আয়েস ও সুখ বৃদ্ধি করেছে। কম্প্যুটার নিয়েও মানুষের মনে প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। প্রশ্ন, যন্ত্র মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবে, না, মানুষ যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তদুপরি এই যন্ত্রমানব অনেক শ্রমজীবী মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে। বিত্তবানদের নিরুপদ্রব পুঁজি সঞ্চয়ে সাহায্য করছে।

মহাকাশ গবেষণার সুফল মানুষ ভোগ করছে। এ গবেষণার অমিত সম্ভাবনা মানুষ ধারণা করছে। সে সঙ্গে সমগ্র মানবজাতি ও পৃথিবীর জন্য এটি ধ্বংস ডেকে আনার পাঁয়তারাও কষছে। ক্ষমতাধর ধনগর্বী দেশগুলো এই গবেষণাকে তাদের হীন স্বার্থ কায়েমের কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করছে। সে কারণে মানুষের মনে প্রশ্ন আর সন্দেহ।

মাত্র কিছুদিন আগে বিজ্ঞানের রাজ্যে অন্য দুটো আবিষ্কার মানুষের মনে এমনতরো আশাহতাশার দোলাচল সৃষ্টি করেছিলো। আবিষ্কারদ্বয়ের একটি পারমাণবিক বিদ্যা ও দ্বিতীয়টি অণুজীববিদ্যা। অটোহান ১৯৩৯ সনে কৃত্রিম উপায়ে ইউরেনিয়াম পরামাণুর বিভাজন ঘটান। পারমাণবিক বোমা তৈরিতে এ প্রক্রিয়াকে কাজে লাগানো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। সেই বোমার ভয়াবহতা বিশ্ববাসী আজো ভুলতে পারে নি। এখনো এর প্রতিক্রিয়া চলছে। প্রতিক্রিয়া চলছে উদ্ভিদ ও প্রাণি জগতে, পরিবেশ–প্রতিবেশে। মানুষ এই প্রথম বিজ্ঞানের প্রতি গভীর সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করে। যাহোক, ১৯৫০ সনে এই পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কাজে কল্যাণকর ভূমিকা পালনে এগিয়ে এলো। মানুষ আশ্বস্তবোধ করলো

১৯৫০ সনেই অণুবিজ্ঞানীরা ঘটালেন আরেক বিপ্লব। তাঁরা জীবনসৃষ্টির মৌল অণু ডি.এন.এ–র গঠন রহস্য আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের সূত্র ধরে আবিষ্কৃত হলো কৃত্রিম উপায়ে জিন সংশ্লেষণ পদ্ধতি। ১৯৭০–এর দশকে জীবকোষের প্রাকৃতিক গঠন পরিবর্তনের উপায় উদ্‌ঘাটিত হলো। ডি. এন. এ–র রহস্য মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের বংশগতির সংকেত জানা সহজ করে দিলো। জানা গেলো জিন বিকৃতি ঘটলে দেহে ত্রুটিযুক্ত বা সক্রিয় প্রোটিন তৈরি হয়। ফলে বংশগত বা জন্মগত রোগ যথা সিকল সেল এনিমিয়া (রক্তাল্পতা), হিমোফিলিয়া, বহুমূত্র ইত্যাদি জটিল রোগ সৃষ্টি হয়। প্রচলিত চিকিৎসায় এসব রোগের ওষুধ নেই। বিকৃত জিন দেহ থেকে বদলে দিয়ে সুস্থ জিন দেহে প্রতিস্থাপন করতে পারলে সমাধান সম্ভব। এ চিকিৎসার নাম "জিন থেরাপি" বা "জেনেটিক সার্জারি"। জিন সংশ্লেষণ ও কোষের গঠন পরিবর্তন জিন প্রযুক্তির অন্তর্গত। শুধু চিকিৎসা ক্ষেত্রে নয় জিন প্রযুক্তি মানবজাতির জন্য আরো অনেক সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি বয়ে এনেছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, নতুন ও সস্তা শিল্প দ্রব্য উৎপাদন, পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা ইত্যাদিও জিন প্রযুক্তির সাহায্যে সম্ভব। কিন্তু এই প্রযুক্তিকে মানববিধ্বংসী কাজে ব্যবহারের সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে। প্রতিপক্ষ জেনেটিক প্রকৌশলের সাহায্যে অন্যপক্ষের জ্বালানি ধ্বংসে মেতে উঠতে পারে। কৃত্রিম রোগ ছড়িয়ে দিতে পারে। জটিল, সূক্ষ্ম এই বিনাশী চক্রান্ত সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষ এখনো সচেতন নয়। তাই এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও সন্দেহ ঘনীভূত হয় নি। বিবেকবান, সচেতন মানুষ কিন্তু এ ভয়াবহ মারণাস্ত্রের ভয়ে আতঙ্কিত ও শংকিত। এখানেও প্রশ্ন, এ গবেষণার প্রয়োজন কতখানি ?

মহাকাশ গবেষণা ও মহাকাশ প্রযুক্তির শৈশব উত্তীর্ণ না হতেই কৈশোরে পা দিলো। গবেষণার বয়স মাত্র ত্রিশ বছর। ১৯৫৭ সনের ৪ অক্টোবর সোভিয়েতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক–১ প্রথম মহাকাশে পাড়ি জমায়। স্পুটনিকের মহাকাশ জয়ের পর থেকে দুই মহাশক্তিধর সোভিয়েত ও আমেরিকা মহাকাশ অভিযানে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নামে। উভয় দেশ অভূতপুর্ব সাফল্যও অর্জন করে। মানুষ আজ মহাশূন্যে ভেসে বেড়ায়। এক মহাকাশযান থেকে অপর মহাকাশযানে পাড়ি জমায়। পৃথিবী থেকে মহাকাশযানকে নিয়ন্ত্রণ করে দুটো যানের মধ্যে সম্মিলন ঘটায়। মহাকাশযান নেমেছে চাঁদের পিঠে। লালগ্রহে। এতো গেলো মহাকাশ জয়ের ব্যাপার। কিন্তু এ ছাড়া মহাকাশ অভিযান মানুষের অনেক উপকারে এর ভূমিকা রাখছে। সংক্ষেপে তার বিবরণ দেখা যেতে পারে। বাহুল্য বলা যে, মহাকাশ অভিযানে ইতিমধ্যে আরো কয়টি দেশ সাফল্য এনেছে। এদের মধ্যে চীন, ভারত অন্যতম।

আবহাওয়া

প্রথমে আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। পূর্বে ওয়েদার কক ও বেলুনের সাহায্যে বাতাসের গতি ও দিক নির্ণয় করা হতো। পরে বিমানকে এ কাজে ব্যবহার করা হয়। এখন এ দায়িত্ব নিয়েছে আবহাওয়া উপগ্রহ। মহাকাশে ঘূর্ণায়মান এই উপগ্রহে রয়েছে উন্নতমানের ক্যামেরা, র‍্যাডার ও রেডিও–তরঙ্গ মাপার সূক্ষ্মযন্ত্র। এ সবের সাহায্যে জল ও স্থলভাগে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়, টর্পেডো, হ্যারিকেন, প্রবল বৃষ্টিপাত বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্কেত আগেভাগে ধরা যায়। উপগ্রহ এই সঙ্কেত পৃথিবীতে পাঠায়। ফলে লক্ষ কোটি মানুষের অমূল্য জীবন ও হাজারো কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা সম্ভব হয়। এর উদাহরণ অজস্র। ১৯৭০ সনে বাংলাদেশে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব–পাকিস্তানে যে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আসে তার সংবাদ ১০ ঘন্টা আগে উপগ্রহ মারফত জানা যায়। কিন্তু তৎকালীন সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় লাখ লাখ মানুষ, গবাদি পশু ও বহু সম্পদ নষ্ট হয়। ১৯৭৪ সনে কুখ্যাত হ্যারিকেন ঝড় 'কারমেন' ও 'ফিফি' র কথা কৃত্রিম উপগ্রহ না জানালে লক্ষ লক্ষ মানুষ ও কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস হতো। শুধু বিপৎকালীন সংবাদ নয়, বিমানের পাইলট, সমুদ্রপোতসমূহের নাবিক ও মাঝি, কৃষিজীবীকে প্রতিদিন আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া দরকার। পূর্বাভাস বিশ্বস্ততার সাথে সরবরাহ করছে কৃত্রিম উপগ্রহ।

কৃত্রিম উপগ্রহ 'নিম্বাস' ১১২০ কিলোমিটার উচ্চতায় থেকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বরাবর বৃত্তপথে প্রদক্ষিণ করছে এবং ২৪ ঘন্টায় দু'বার পৃথিবীর তাপমাত্রা ও আবহাওয়ার মানচিত্র তৈরি করছে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে ৩৫,৬৮০ কিলোমিটার উঁচুতে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করছে সমলয় কৃত্রিম উপগ্রহ। এই উপগ্রহ ব্রাজিলের পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর নির্দিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ করতে করতে দিনরাত প্রতি ৩০ মিনিট পর পর আমেরিকার আবহাওয়া সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছে। কৃত্রিম উপগ্রহের রয়েছে মাইক্রোওয়েভ সেনসার। ফলে এটি দিনের আলো, রাতের অন্ধকার, ঘন মেঘ, বৃষ্টি ও তুষারপাতের মধ্যেও একইভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। সমুদ্রের আবহাওয়া, স্রোতের গতি, পানির উচ্চতা ইত্যাদি বিষয় জানা থাকলে জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ে বা তার আগে গন্তব্যে পৌছুতে পারে। ফলে জ্বালানি বাঁচে ও বিপদ থেকে রক্ষা পায়। উপগ্রহ হিমশৈল, বরফের ঘনত্ব, ভর সম্বন্ধেও ধারণা দেয়। ফলে জাহাজ নিরাপদে চলাচল করতে পারে। আবহাওয়া কৃত্রিম উপগ্রহ ভবিষ্যতে কেবল সংবাদ সরবরাহ করবে না, আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাতকেও নিয়ন্ত্রণ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

যোগাযোগ

দ্বিতীয়ত, কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগের কথা বিবেচনা করা যায়। মাত্র সেদিন আমরা বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলা দেখলাম টেলিভিশনে। আমেরিকা থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হলো। এই কীর্তি কৃত্রিম উপগ্রহের। পূর্বে যোগাযোগের মাধ্যম ছিলো টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন। কিন্তু অতো দূর দূর দেশে টেলিফোনের তার নিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য। এ ছাড়া রয়েছে উত্তুঙ্গ পর্বত ও অতলান্ত সাগরের প্রতিবন্ধকতা। ঝড়ঝঞ্ঝা ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, অনর্থ সৃষ্টি করতে পারে। তাই, অনিশ্চিত যোগাযোগ ব্যবস্থা। এসব অসুবিধা বর্তমানে আর নেই। কম্যুনিকেশন স্যাটেলাইট বা যোগাযোগ উপগ্রহ যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করেছে। হাজার হাজার মাইল দূরের ঘটনা মুহূর্তে টেলিভিশন, বেতার ও রেডিও মারফত জানা যাচ্ছে। দূরের মানুষ পরস্পরের মধ্যে বার্তা বিনিময় করছে।

এ প্রক্রিয়ার কৌশল কি ? পৃথিবী থেকে বেতারতরঙ্গ প্রথমে যায় কৃত্রিম উপগ্রহে। কৃত্রিম উপগ্রহ তা বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে অন্যত্র সরবরাহ করে। সমুদ্রে স্থাপিত একটি বড় তার যেখানে ১৮৪০টি টেলিফোন সংযোগ করতে পারে সেক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহ পারে ৩০০০ সংযোগ স্থাপন করতে। বর্তমানে প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক

মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপর তিনটি সমলয় বা স্থির কক্ষপথের কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা হয়েছে। এই তিনটি উপগ্রহ একসাথে পৃথিবীর সব স্থানের সাথে যোগাযোগে সক্ষম। ১৯৭৪ সনে আমেরিকার 'নাসা' আটটি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ উপগ্রহ বা ইন্টারন্যাশনাল টেলিকম্যুনিকেশন স্যাটেলাইট, সংক্ষেপে ইনটেলস্যাট মহাকাশযান মহাকাশে পাঠিয়েছে। পৃথিবীর ৯০টি দেশ এসবের ব্যয়ভার বহন করছে। এসব দেশ তাৎক্ষণিকভাবে অন্যদেশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দেখতে পাচ্ছে। তদুপরি একই দেশের দূর জনপদে বা বিভিন্ন দেশে জনশিক্ষা, কৃষ্টি ও চিকিৎসা প্রভৃতির প্রচারণাও কৃত্রিম উপগ্রহ সম্ভব করে তুলেছে। অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে 'আন্তর্জাতিক আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়' শিক্ষাব্যবস্থা চালু হবে আশা করা যায়। যোগাযোগ উপগ্রহ প্রকৃতপক্ষে সমস্ত পৃথিবীকে একটি ছোট গ্রামে পরিণত করেছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ

প্রাকৃতিক সম্পদ সন্ধানে, সনাক্তকরণে ও আহরণে কৃত্রিম উপগ্রহের তৃতীয় বৃহৎ ভূমিকা রয়েছে। পৃথিবীর অনেক অঞ্চল এখনো দুর্গম ও বিশাল জলরাশির অনেক রহস্য অজানা। অগম্য অঞ্চলের খনিজ–প্রকৃতি বা বনসম্পদ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা নেই। এসব অঞ্চলে অনুসন্ধান–কাজ পরিচালনা করা সময়সাপেক্ষ ও প্রচুর ব্যয়-সাধ্য। এতে জীবননাশের সম্ভাবনাও প্রচুর। এসব সমস্যার সমাধান এনেছে ল্যান্ডস্যাট বা ল্যান্ডস্যাটালাইট, ভূমি জরিপ উপগ্রহ।

কিভাবে জরিপ চালানো যায় ? সূর্য থেকে ইনফ্রারেড বা অবলোহিত রশ্মি এসে পড়ে পৃথিবীতে। রশ্মি ভূত্বকের গুণানুসারে শোষিত হয় এবং আংশিক প্রতিফলিত হয়। কোন্ বস্তু থেকে প্রতিফলিত হলো, তার উপর নির্ভর করে প্রতিফলিত অবলোহিত রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিফলক বস্তুর স্বরূপ জানা সম্ভব হয়। এভাবে স্থলভাগে ধাতু, অধাতু, খনিজ সম্পদ, মাটির উপাদান, জলসম্পদ, কৃষিসম্পদ, বনসম্পদ ইত্যাদির অবস্থিতি ও পরিমাপ সম্বন্ধে জানা যায়। অবলোহিত রশ্মির প্রতিফলিত অংশের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিশ্লেষণ করে ল্যান্ডস্যাট।

পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে কিসের খনি আছে, কোথায় মজুদ তৈলভাণ্ডার আছে, কোন্ বনে কি জীবজন্তু আছে, কোন্ পরিবেশে কোন্ জীবজন্তুর কিরকম বংশবৃদ্ধি হয়, কোন্ প্রাণী বিলুপ্তির পথে, বিলুপ্তির পথে কোন্ উদ্ভিদ, কোন্ অঞ্চলের মাটির গুণাগুণ কি ধরনের, কোন্ মাটিতে কোন্ ধরনের ফসলের উৎপাদন বেশি হওয়া সম্ভব, ফসলে

কীটপতঙ্গ ও পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব হবে কি না, কীটনাশক ব্যবহারে শস্য-ফলন হ্রাস পাবে কি না, পৃথিবীর কোথায় ভূমিক্ষয় হচ্ছে, কোথায় বনসম্পদ হুমকির মুখে, পরিবেশ কিভাবে কতটা দূষিত হচ্ছে ইত্যাদি ল্যান্ডস্যাটের সাহায্যে জানা যাচ্ছে এবং সম্ভাব্য প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে।

সামুদ্রিক উপগ্রহ ইনফ্রা রেড সেন্সার বা অবলোহিত স্পর্শীর সাহায্যে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা মাপতে পারে, জলজ উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন কোন্ কোন্ জলসীমায় কতটুকু আছে এবং তা সে অঞ্চলের মজুদ মাছের জন্য পর্যাপ্ত কি না জানা যাচ্ছে। মাছের বিচরণক্ষেত্রেও সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। সমুদ্রের তলায় সঞ্চিত খনিজ ও তৈলসম্পদের বিবরণও পাওয়া যাচ্ছে। মাটির নিচে গভীরে মিঠা পানির সুখবরও দিচ্ছে ল্যান্ডস্যাট। সমুদ্রে স্থলভাগের উত্থানের সম্ভাবনার কথাও ল্যান্ডস্যাট জানাচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ অংশে বিশাল ভূখণ্ড জাগার সংবাদ পরিবেশন করে এই কৃত্রিম উপগ্রহ। সমুদ্রের খবর জোগায় যে উপগ্রহ তাদের নাম ম্যারিস্যাট বা সীস্যাট।

স্ফটিক

পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে উন্নত মানের নিখুঁত স্ফটিক তৈরি করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ হোমোজেনাস বা সমসত্ত্ব স্ফটিক তৈরি করা যায় না। এ ধরনের স্ফটিক ইলেকট্রনিকস শিল্পে, সেমিকন্ডাক্টার, কম্প্যুটার, লেসার ইত্যাদি তৈরিতে অপরিহার্য। গলিত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হওয়ার সময় মিশ্রণে কোনো রকম অপদ্রব্য থাকলে স্ফটিক নিখুঁত হয় না। আবার মিশ্র পদার্থ দিয়ে তৈরি স্ফটিক ঠাণ্ডা হওয়ার সময় অপেক্ষাকৃত ভারি পদার্থ পৃথিবীর অভিকর্ষবলের জন্য পাত্রের তলায় আগে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই স্ফটিক সম্পূর্ণ সমসত্ত্ব হয় না। পাত্রের চাপে স্ফটিকের আকৃতি বিকৃত হতে পারে। মহাকাশে এ ধরনের বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা নেই। কারণ সেখানে অভিকর্ষ বল শূন্য। সেখানে পাত্রের প্রয়োজন নেই। ফলে দূষিত বা আকারে বিকৃত হবার সম্ভাবনা নেই।

সঙ্কর ধাতু

সঙ্কর ধাতু তৈরির ক্ষেত্রেও একই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। পৃথিবীতে মিশ্রিত ধাতুসমষ্টির মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভারি ধাতু পাত্রের তলায় জমা হতে পারে। ফলে মিশ্রণ সমসত্ত্ব হয় না। অভিকর্ষ বলের কারণে এরকমটি হয়ে থাকে। মহাশূন্যে ধাতুর অণুসৃষ্টি সমভাবে সন্নিবিষ্ট হওয়ার দরুন নিখুঁত সঙ্কর ধাতু সৃষ্ট হয়। উন্নতমানের

ঝালাই ও বল বেয়ারিং তৈরির ক্ষেত্রেও মহাশূন্যকে ব্যবহার করলে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সহজ হবে।

মহাকাশে বিভিন্ন স্টেশনে গবেষণাগার স্থাপন করে আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসই নিখুঁতভাবে তৈরি করা সম্ভব।

উচ্চতাপ রসায়ন ও ধাতুবিদ্যা

হাইটেমপারেচার কেমিষ্ট্রি অ্যান্ড মেটালারজি বা উচ্চতাপ রসায়ন ও ধাতুবিদ্যা রসায়নশাস্ত্রের এক নূতন শাখা। মহাকাশযান তৈরি করতে গিয়ে রসায়নের এই শাখার উদ্ভাবন করতে হয়েছে। মহাকাশযানকে নানান প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে হঠাৎ মাত্রাতিরিক্ত তাপ সৃষ্টি হয়। মোকাবেলা করতে হয় প্রচণ্ড গতির ও কম্পনের। মাধ্যাকর্ষণের টানকে ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতে হয়। তদুপরি শক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন কণা যথা রিলেটিভিশটিক ইলেকট্রন, প্রোটন, আয়নিত নিউক্লিয়াস প্রভৃতির বর্ষণ মহাকাশযানকে সহ্য করতে হয়। এরকম অবিরাম আঘাত মহাকাশযানের ধাতব আবরণের ক্ষতি করতে পারে। এর সহনক্ষমতা ও কর্মক্ষমতা হ্রাস করতে পারে। কোনো একটি ধাতু এতো সব বাধা অতিক্রম করে অক্ষত থাকা অসম্ভব। এর জন্য এলুমিনিয়াম, টাইটেনিয়াম, জারকোনিয়াম, ইনডিয়াম প্রভৃতি ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সঙ্কর ধাতু। এই ধাতু আকস্মিক চাপ ও পরিবর্তিত তাপ সহ্য করায় সক্ষম। মহাকাশে শূন্য মহাকর্ষ বলের পরিবেশেও তা অপরিবর্তিত থাকে। শিল্প-কারখানায় যেখানে অতিরিক্ত চাপ ও তাপের পরিবেশ রয়েছে সেখানে নব আবিষ্কৃত এই সঙ্কর ধাতু ব্যবহার করা হচ্ছে।

পলিমার রসায়ন

মহাকাশচারীর পোশাক নিয়ে ভাবতে গিয়ে পলিমার রসায়নের সৃষ্টি। মহাকাশচারীর পোশাক হতে হবে হালকা, তাপ সহনক্ষম। এদের পোশাকে বিশেষ রকমের ফাইবার গ্লাস ও টেফলনের আস্তরণ দেয়া হলো, এবং পলিবেনজিমিডাজোল, ডিউরেট, ফিনল প্রভৃতি সংশ্লেষিত হলো। কিনল্ ২৫০০$^{\circ}$ সেলসিয়াসেও অপরিবর্তিত থাকে। বিশেষভাবে তৈরি প্লাস্টিক ফোমও মহাকাশচারীর পোশাকে যুক্ত করা হলো পোশাক রক্ষাকারী হিসাবে। পৃথিবীতে বছরে প্রায় পাঁচ থেকে দশ হাজার দমকল বাহিনীর লোক আগুনে পুড়ে মারা পড়ে। তাঁদের জন্য এ পোশাক ত্রাণকারীর ভূমিকা নিতে পারে।

মহাকাশচারীর নাইলনের পোশাকের উপর শূন্য চাপে এলুমিনিয়ামের হালকা প্রলেপ দিয়ে এক প্রকার পোশাক বানানো হয়। এটি মানুষের দেহ থেকে শতকরা ৮০ ভাগ তাপ নিষ্ক্রমণে বাধা সৃষ্টি করে। যাঁরা অত্যধিক ঠাণ্ডা পরিবেশে কাজ বা গবেষণা করেন তাঁদের জন্য এ পোশাক আশীসস্বরূপ।

মহাকাশযানে এক ধরনের ফোম ব্যবহৃত হয়। ফোমের নাম পলিইউথেরিন। পলিইউথেরিন পুড়ে পুড়ে মহাকাশযানের চারদিকে একটা ত্রাণকারী আবরণ সৃষ্টি করে যার থেকে নির্গত গ্যাস বাতাসের অক্সিজেনকে আগুনের সংস্পর্শে আসায় বাধা দেয় এবং এভাবে অগ্নি নির্বাপণে সহায়ক হয়। এ ছাড়া মহাকাশযানকে ঘর্ষণজনিত তাপে আগুনে পোড়া থেকে রক্ষার জন্য এক ধরনের রঙ ও অ্যাবলেটিং পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। মহাকাশযানের 'নাসিকা' ও তলদেশে এসবের প্রলেপ দেয়া হয়। ঘর্ষণে প্রলেপ উত্তপ্ত হয়ে বিগলিত হয় এবং তাপ অপরিবাহী গ্যাস হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ঘর্ষণজনিত উত্তাপ মহাকাশযানে সঞ্চালিত হতে পারে না। এ সব বস্তুকে বাড়ি–ঘরে প্রলেপ হিসেবে ব্যবহার করলে জানমাল রক্ষা পাবে। হাসপাতালে ও শল্য চিকিৎসা–কক্ষে এসব ব্যবহার করা হচ্ছে।

কাচ ও কার্বনের মিশ্রণে নির্মিত শক্ত ফোম মোটরগাড়ি, বিমান, রেল ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাইরোন তাপ–অপরিবাহী ও বৈদ্যুতিক ধর্মসম্পন্ন। একে ইলেকট্রনিক শিল্প ও বিমানে ব্যবহার করা হচ্ছে। জ্বালানি পাত্রে তাপ প্রতিরোধক বিশেষ প্লাস্টিক ফোম বর্তমানে মাছ ধরার কাজে লাগছে। মোটর, রেল, বিমানে শীততাপ নিয়ন্ত্রণেও এর ভূমিকা চমৎকার। হাইস্টীল নামে ফোম রকেটের জন্যে নির্মিত হয়েছিলো বটে। কিন্তু পরে তা ব্যবহৃত হয় নি। ইস্পাত থেকে শক্ত অথচ কম অনমনীয় এই স্টীল এখন মোটরগাড়ি তৈরির কাজে লাগছে। উল্লেখিত সবই মহাকাশ বিজ্ঞানের অবদান।

ডাই–নাইট্রো–ডাই–টলুউন বা ডিডিটি সম্পর্কে মানুষ শঙ্কিত। এর সুদূরপ্রভাবী বিষক্রিয়া মানবজাতির জন্য হুমকিস্বরূপ। মহাকাশবিজ্ঞানীরা মহাকাশ গবেষণার উপজাত হিসেবে নতুন ধরনের ডিডিটি তৈরির সূত্র আবিষ্কার করেছেন। এই ডিডিটি খুব কার্যকরী কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তার কার্যক্ষমতা লোপ পায়।

মহাকাশযানের জ্বালানি হওয়া দরকার হাল্কা, সহজদাহ্য, অত্যধিক বিস্ফোরণক্ষম, উত্তাপ সৃষ্টিক্ষম ও পরিমাণে কম। ১৯২৬ সনে গর্ডাডের রকেটে জ্বালানি ছিলো কার্বন, সালফার ও পটাশিয়াম নাইট্রেট। জারক ছিলো হাইড্রোজেন পার অক্সাইড। বর্তমানে প্রধানত দুধরনের জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে। কঠিন জ্বালানি ও

তরল জ্বালানি। কঠিন জ্বালানিতে থাকে এলুমিনিয়াম পাউডার; জারক–এমোনিয়াম পার ফ্লোরেট বা হাইড্রোজেন পার অক্সাইড। তরল জ্বালানি কেরোসিন, তরল হাইড্রোজেন বা ফিনাইল হাই ড্রাজিন ; জারক–হাইড্রোজেন পার অক্সাইড বা অক্সিজেন। অতি সম্প্রতি এ ধারণারও আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। বর্তমানে বিশেষ ধরনের পলিমার, হাইপলিমার, ম্যাক্রোমলিকিউল ও নানান জৈবপদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। স্বল্পব্যয়ে এসব বিকল্প জ্বালানি তৈরি সম্ভব হলে একালের একটা বড় সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। মহাকাশযান থেকে তথ্য সংগ্রহে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োজন। এ সমস্যার সমাধান দিয়েছে সিলিকন সৌরকোষ। বালি থেকে সিলিকন নিষ্কাশন করে এর উপর বোরন প্রলেপ দেয়া হয়। এই কোষে পানি, অ্যাসিড বা ক্ষার নেই। একে সূর্যের আলোর দিকে মেলে ধরলে কোষ বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত হয়। বিজ্ঞানীদের আশা সৌরকোষ বিদ্যুতের বিকল্প চাহিদা মেটাবে।

পুষ্টি রসায়ন

মহাকাশযানের এমন খাদ্য বহন করতে হয় যার ওজন কম, আয়তন কম অথচ খাদ্যগুণ ও ঘনত্ব বেশি। এ ছাড়া উষ্ণ আবহাওয়ার পরিবেশেও একে টিকে থাকতে হবে। বিজ্ঞানীরা ৩২টি বিভিন্ন ধরনের খাদ্যকে এক সঙ্গে চাপে রেখে এক সংকর খাদ্য বানিয়েছে। এটি ইটের সাইজের চেয়ে একটু বড়। ওজন ১০ পাউণ্ড। প্রতি টুকরোয় অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে রয়েছে মুরগী ও গরুর মাংস, আলু, পনির, বেকন ও টুনা মাছ ইত্যাদি। এর খাদ্যগুণ ২২ কিলোক্যালোরি। এটি খেয়ে কোনো লোক ১০ দিন সুস্থ থাকতে পারে। আহারে সময় লাগে ৫ মিনিট। এ ছাড়া খাবার কাঠিও তৈরি করা হয়েছে। এই কাঠি সিগারেটের চেয়ে একটু বড়। প্রতি খাদ্য কাঠির ক্যালোরি মান ৪৪। এতে শতকরা আট ভাগ প্রোটিন, সত্তর ভাগ কার্বোহাইড্রেট ও তের ভাগ ফ্যাট রয়েছে। বাকিটা ভিটামিন ও খনিজপদার্থ। যেখানে খাদ্যাভাব প্রকট সেখানে জীবনরক্ষার জন্য এবং লোকালয় থেকে দূরে বসবাসকারী পশু, মৎস্য শিকারীর জন্য, ঘন ঘন শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজনে খেলোয়াড়, শিশু–কিশোরদের জন্য এসব খাদ্য প্রয়োজন বলে ভাবা হচ্ছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞান

শূন্য অভিকর্ষ বল, দ্রুত গতি ও পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে মহাশূন্যে জীবদেহে নানা পরিবর্তন সূচিত হয়। দেখা গেছে মানুষ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর দেহ থেকে

ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, নাইট্রোজেন, পানি, ইউরিন, হাইড্রক্সি পলিন, ও বিভিন্ন ধরনের ক্লোরাইড বেরিয়ে যায়। দেহে শ্বেতকণিকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং লোহিতকণিকা কমে যায়। ফলে দেহে তরল পদার্থের অভাব ঘটে ও দেহ ভারসাম্য হারায়। এতে ক্লান্তি, অবসাদ, বিমর্ষতা দেখা দেয়। মানবদেহের ক্রোমোজমে পরিবর্তন ঘটে ও কোষ বিভাজন স্বাভাবিকভাবে হয় না। এ সবের কারণ হিসেবে সম্ভবত ভরশূন্যতা, অক্সিজেনের প্রাচুর্য, মহাজাগতিক রশ্মি দায়ী।

মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বচ্ছতা ও দেহের ভারসাম্য রক্ষায় অ্যাড্রিনোকরটিট্রোপিক হরমোন, করটিসল, রেনিন, অ্যানডিডাইরোপিক হরমোন ক্যালসিটোনিন, প্যারাথাইরোক্সিন, সিরাম, থাইরোক্সিন প্রভৃতি সক্রিয় থাকে। মহাশূন্যে এসব হরমোন কিভাবে কাজ করে জানা গেলে শারীরিক ও মানসিক চাপের মধ্যে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে।

মহাশূন্যে মানুষের পেশী শিথিল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বনডাই–অক্সাইড ত্যাগের আনুপাতিক হার হিসেব করে সে সময়ের শারীরিক বিক্রিয়ার চিত্র পাওয়া যায়। এই বিক্রিয়ায় শক্তিব্যয়ের পরিমাণও জানা যায়। এসব তথ্য পুষ্টি বিষয়ে বোঝার পক্ষে সহায়ক হয়।

মহাজাগতিক রশ্মি দেহে কিরূপ বিক্রিয়া করে গবেষণা করতে গিয়ে কয়েক ধরনের ক্যানসারের প্রকৃতি ও ক্যানসার কোষের বিভাজনের রহস্য ধরা পড়েছে। এ অবস্থায় তন্তু-এনজাইমের ক্রিয়া গবেষণায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যের এনজাইম ডাইপেপটিডাইল অ্যামাইনো অ্যাসিড আবিষ্কৃত হয়েছে। এনজাইমটি মানবদেহের দীর্ঘ প্রোটিন অণুসমূহকে বুঝতে সাহায্য করে। মহাকাশযানের জ্বালানি গবেষণায় আবিষ্কৃত হয়েছে তরল নাইট্রোজেনের প্রস্তুত পদ্ধতি। তরল নাইট্রোজেন আবিষ্কার "ক্রায়োসার্জারি-র" উদ্ভাবন ঘটিয়েছে। অত্যন্ত কম তাপমাত্রায় শল্য চিকিৎসার নাম ক্রায়োসার্জারি। তরল নাইট্রোজেনের তাপমাত্রা মাত্র ১৫.৯৫ সেলসিয়াস। এ পদ্ধতি এখন পারকিনসন্স্ ডিজিজ, প্রস্টেট গ্ল্যান্ড, জরায়ু, মলাশয়, টনসিল প্রভৃতি অপারেশনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

টেলিমেট্রি পদ্ধতিতে মহাকাশচারীর দেহের তাপ, হৃদকম্প, নাড়ির গতি, রক্তের চাপ ইত্যাদি মাপা হয়। একে বলা যায় দূর-চিকিৎসা। ছোঁয়াচে রোগ, খাঁচায় আবদ্ধ লোহার ফুসফুসধারী রোগী, আগুনে পোড়া জীবাণুনাশক আবরণে ঢাকা রোগীর তাপ, হৃৎকম্প ইত্যাদি এ পদ্ধতির সাহায্যে চিকিৎসা করা হচ্ছে। যে যন্ত্র দিয়ে এসব পরীক্ষা করা হয় এর নাম বায়োটেলিমিটার।

কৃত্রিম উপগ্রহ অ্যাপোলো সমুদ্রে নামার সময় পানিতে এর চাপ মাপার জন্য এক ধরনের সেনসর বা স্পর্শী ব্যবহার করা হয়। এখন এ ধরনের ছোট স্পর্শী মানবদেহে কৃত্রিম অঙ্গ জোড়া লাগানোর সময় এবং অস্থি সংযোগের সময় ব্যবহার করা হচ্ছে। স্পর্শী দেহের কোন অংশে কতটা চাপ সহ্য হবে তা পরিমাপ করতে পারে। মহাকাশযানে সূক্ষ্ম উল্কার আঘাত মাপার জন্য আরেক ধরনের স্পর্শী ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসকরা বর্তমানে এই স্পর্শী স্নায়বিক রোগ ও পেশীর কম্পন রোগ এবং শিশুর শ্বাসকষ্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছেন। মহাকাশচারীর শরীরে অন্য ধরনের স্পর্শী লাগানো থাকে। এটি বাহকের হৃৎপিন্ডের ই.সি.জি. চিত্র তুলে ধরে। বর্তমানে এটি অ্যাম্বুলেন্সে রাখা হয়। হাসপাতালে পৌঁছার আগেই ডাক্তার এর সাহায্যে তাঁর কর্তব্য স্থির করতে পারেন। মহাকাশচারীদের জন্য প্লিথিমোগ্রাফ যন্ত্র হৃদযন্ত্র পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হতো। এখন তা রোগীদেহে হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপনের সময় ব্যবহার করা হয়। এটি মানুষের দেহের হাড়ের স্থিতিস্থাপকতা মেপে হাড় হঠাৎ ভঙ্গুর হবার সম্ভাবনা আছে কি না জানিয়ে দেয়।

মহাকাশচারীর মস্তিষ্ক–তরঙ্গ মাপা হয় সেনসর বা স্পর্শী লাগানো এক প্রকার টুপির সাহায্যে। এই টুপি বর্তমানে হাসপাতালে রোগীর মাথায় পরানো হচ্ছে। টুপির গ্রাহক যন্ত্রে মস্তিষ্ক তরঙ্গ ধরা পড়ে।

মহাকাশচারীরা চাঁদের মাটিতে চলার জন্য ছয় পাওয়ালা 'চলন্ত চেয়ার' ব্যবহার করেছিলেন। এই চেয়ার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে, চড়াই–উত্রাই, নরম–শক্ত মাটিতে চলতে পারে। প্রতিবন্ধীদের জন্য বর্তমানে এ ধরনের চেয়ার ব্যবহার করা হচ্ছে

মহাকাশযানের আরোহী গ্র্যাভিটেশন স্যুট (জি.স্যুট বা অভিকর্ষ স্যুট) পরিধান করেন। স্যুটের বিভিন্ন স্থানে কলার দেয়া থাকায়, এই পোশাক পেট ও শরীরের নিচের অংশে চাপ সৃষ্টি করে এবং বুকের নিম্নাংশে রক্ত প্রবাহকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখে। হাসপাতালে রোগীদের জি. স্যুট পরানো হচ্ছে। আরোহীরা আর এক ধরনের জি. স্যুট ব্যবহার করেন যার মধ্যে চাপ বাড়ানো ও কমানো যেতে পারে। কোনো কারণে রোগীর রক্তপাত বন্ধ না হলে এই পোশাক পরলে সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ হয়। কারণ, এই পোশাক রোগীর ধমনী ও বহির্পেশীর মধ্যেকার চাপের তারতম্য দূর করে। মহাকাশে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক ক্যামেরা দিয়ে চিকিৎসক হৃদপিণ্ডে ক্ষত হলে তা সরাসরি দেখতে পান।

Library Dhaka

সৌরজগৎ

মহাকাশ অভিযানের ফলে সূর্য ও সূর্যের পরিবার সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে। পৃথিবীতে থেকে গবেষণা করা এক কথা, আর পৃথিবীর বাইরে গিয়ে সৌরজগৎকে দেখা অন্য কথা। দূরে থেকে পৃথিবীকে খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা করা সহজ হয়েছে। সূর্যের গঠনে প্লাজমা ও প্লাজমার ভূমিকা মহাকাশ গবেষণায় ধরা পড়েছে। চন্দ্র, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল, ইউরেনাস, নেপচুন, শনি অর্থাৎ এককথায় সৌর পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের তথ্য স্বচ্ছভাবে জানা গেছে।

দেখা যাচ্ছে মহাকাশ গবেষণা মানবজাতির জন্য অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। মহাকাশে স্টেশন স্থাপনের খবরে সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলো মাত্র সেদিন। অথচ আজ অনেক প্রশ্ন, অনেক সন্দেহ মানুষের মনে দানা বাঁধার কারণ কি। মহাকাশ বিজ্ঞানকে পররাজ্যগ্রাসে, পর রাজ্যে প্রভূত্ব বিস্তারে লাগানোর পাঁয়তারা চলছে। সোজা কথায় মহাকাশ বিজ্ঞানকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করার হুমকি শুরু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে মহাকাশে যতোগুলো উপগ্রহ রয়েছে তার শতকরা নব্বই ভাগই সামরিক উদ্দেশ্যে নিযুক্ত। এর কতকগুলো গুপ্তচর উপগ্রহ। গুপ্তচর উপগ্রহের কাজ মহাকাশ থেকে সম্ভাব্য শত্রুপক্ষের ঘাঁটি সম্বন্ধে তত্ত্বতালাশ করা। কতকগুলো সতর্কীকরণ উপগ্রহ। এগুলোর কাজ শত্রুর উৎক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র সম্বন্ধে সতর্ক করে দেয়া। কৃত্রিম উপগ্রহকে ধ্বংস করার জন্য প্রতি–উপগ্রহ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র মহাকাশযান নিক্ষেপ করে এই ধ্বংসকাজ চালানো হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্টার ওয়ারস বা তারকা যুদ্ধ, এক কথায় বলতে গেলে মহাকাশ যুদ্ধের তোড়জোর করছে। ফলে 'খুনী উপগ্রহ', 'শিকারী উপগ্রহ' ছাড়াও লেসারবাহী উপগ্রহ ইত্যাদির তৎপরতা বাড়ছে। লেসার যন্ত্রের ব্যবহার সমগ্র মানবজাতির জন্য এমন সর্বনাশ ডেকে আনবে যা অভাবিতপূর্ব ও লোমহর্ষক।

পৃথিবীতে যুদ্ধ হলে এক মারণাস্ত্র অপর মারণাস্ত্রকে ঠেকাতে পারবে। কিন্তু মহাশূন্য থেকে যুদ্ধ পরিচালিত হলে বিশাল পরিমণ্ডলে কেউ কাউকে রুখতে পারবে না। ফলে প্রায় সমগ্র মানবজাতি ও সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মৃত্যু ও ধ্বংস।

আইনস্টাইনকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ হলে মানুষ ডালপালা ও পাথর নিয়ে যুদ্ধ করবে।